শাশ্বত ভারত গ্রন্থমালা

নবরূপে তিতুমীর

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

অমৃত শরণ প্রকাশন

প্রকাশক :
শ্রী আদ্যনাথ বসু
অমৃত শরণ প্রকাশন
বিদ্যাসাগর রোড, নবপল্লী, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩২০৩

প্রাপ্তিস্থান :
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯
গ্রন্থরশ্মি
২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৬
বিশ্বজ্ঞান
৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯
দে বুক ষ্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ : গণেশ বসু

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা

অক্ষর বিন্যাস
মডেল কম্পিউটার সেন্টার
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : ডায়নামিক প্রিন্টার্স
২৪এ বাগমারি রোড
কলিকাতা ৭০০ ০৫৪

উৎসর্গ

সখা ও পথপ্রদর্শক

স্বপন বসুকে

ইতিহাস এক সুদূরস্পর্শী জোরালো বিষয়। রাজনীতি প্রায়শই রচিত হয় ইতিহাসের ভিত্তিভূমিতে। যে জাতি ইতিহাস ভুলে যায়, ইতিহাসকে বিকৃত করে, ইচ্ছাপূর্বক অস্বীকার করে বা উপেক্ষা করে, সে জাতি সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে। আবার যে জাতিকে যমদুয়ারে পাঠানো দরকার, .নানা রকম অপলাপবাদী কৌশল নিয়ে সেই জাতির ইতিহাস বিকৃত করা এক লাভজনক উদ্যম।

সীতারাম গোয়েল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পুস্তক রচনায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পুস্তকাদি সরবরাহ করে এবং সর্বদা আলোচনায় যোগ দিয়ে অতুলনীয় সহায়তা করেছেন বিধাননগর কলেজের গনিতের অধ্যাপক, ৺সুহাস মজুমদার। বস্তুত এই পুস্তকে ব্যবহৃত যাবতীয় ইসলামী তত্ত্বের তিনিই ছিলেন আমাদের শিক্ষক। নানাভাবে সহায়তা করেছেন ওই একই কলেজের ইতিহাসের রীডার ডঃ প্রণব চট্টোপাধ্যায়। ঘরোয়া আলোচনায় অনেক তথ্য জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগণ্য বিদ্বান ডঃ স্বপন বসু। তাঁরই বারংবার তাগাদায় পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় যেতে বাধ্য হয়েছে। এই পুস্তকে ব্যবহৃত বহু তথ্যের জেরক্স কপি করে দিয়েছেন জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। অন্য বহু সুধীজন এই পুস্তক রচনায় নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের নাম মুদ্রিত করা সম্ভব নয়। তবে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। এঁরা হলেন শ্রীদেবকুমার বসু, অধ্যাপক অজিত রায়চৌধুরী, শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায়, কল্যাণীয়া স্বপ্না দাস। বন্ধুবর আদ্যনাথ বসু পুস্তক প্রকাশনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে অবশ্যই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এছাড়া কৃতজ্ঞতাবাণী অবশ্য উচ্চারণ করতে হয় সেই মহিলার উদ্দেশ্যে, যিনি গুরুত্বপূর্ণ পেশায় নিযুক্ত থেকেও পুরুষের জন্য চিহ্নিত দৈনন্দিন গৃহকর্মগুলি স্বহস্তে সমাপন করে স্বামীকে এই পেশাবহির্ভূত বিষয়ে পড়াশুনা করার প্রচুর সুযোগ করে দিয়েছেন।

প্রবেশক

আমাদের বাল্যকালে তিতুমীর পাঠ্যের মধ্যে ছিলনা। তিতুমীরের কথা প্রথম অবগত হই পঞ্চাশের দশকে, বারাসতে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের স্মারকপত্রে। ওই পত্রে বারাসতের কৃতী সন্তানরূপে তিতুমীরের সম্পর্কে কয়েক পংক্তি লিখিত ছিল। পরে ওই পঞ্চাশের দশকেই প্রদর্শিত হয়েছিল 'বাঁশের কেল্লা' নামক চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রটি অবশ্য আমরা দেখিনি। কিন্তু যাঁরা দেখেছিলেন তাঁদের মুখে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার যুদ্ধের বর্ণনা শুনতাম। সেই থেকে তিতুমীরের বীরত্ব সম্পর্কে একটি সশ্রদ্ধভাব মনের মধ্যে লালন করে এসেছিলাম। অতি সম্প্রতি বাড়ীর বালকটি যখন সরকারী শিশুপাঠ্যে 'নারকেল বেড়িয়ার লড়াই' আবেগভরে পড়তো, তখন সেই শিশুপাঠ শুনেও বীররসে আপ্লুত হয়ে উঠতাম।

কিন্তু, উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানির উৎস সন্ধানে নির্গত হয়ে হঠাৎই একটি বই হাতে এলো: জয়ন্তী মৈত্রর Muslim Politics in Bengal, 1885-1906, বইটি পড়েই জানলাম, 'তরিকা-ই-মহম্মদীয়া' নামক উগ্র মৌলবাদী আন্দোলনের শরীক ছিলেন তিতুমীর। এবং কোনও স্বাধীনতা-যুদ্ধ নয়, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন মৌলবাদী তিতুমীর। ইতোমধ্যে বিভিন্ন রিলিজিয়নের তত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্য কিছু অধিকার আমাদের জন্মেছে। সেই অধিকারে জেনেছি, জেহাদ প্রচলিত অর্থে ধর্মযুদ্ধ নয়, বিশ্বজুড়ে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করার জন্য যুদ্ধ। সুতরাং 'তরিকা-ই-মহম্মদীয়া' যেহেতু ইসলামী আন্দোলন, এই আন্দোলন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের জন্য ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিকট প্রতিবেশীদের রিলিজিয়ন সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা সীমাহীন। যদিও হরফ প্রকাশনীর কল্যাণে ইসলামের মূলগ্রন্থ কোরাণ বাংলা ভাষায় অতি সহজলভ্য। আর হাদিশের দুই প্রামান্য সংকলন 'সহী বুখারী' এবং 'সহী মুসলিম' হাদিশ বাংলাদেশের প্রকাশকদের কল্যাণে বাংলা ভাষাতেই লভ্য। ইসলাম সম্পর্কে ভারতের তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবিদের' জ্ঞানের সূত্র স্যায়িদ আমীর আলীর প্রচারধর্মী পুস্তক 'স্পিরিট অফ ইসলাম।' আর বাংলার অধ্যাপকদের ইসলাম জ্ঞানের আকরগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের রচনাবলী। এমত পরিস্থিথিতে যথাযথ প্রেক্ষাপটে তিতুমীরকে স্থাপন করার জন্য ইসলামের সঙ্গে পাঠকের প্রাথমিক পরিচয় ঘটানো অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে নিজস্ব উদ্যোগ না নিয়ে Dilip Hiro-র Islamic Fundamentalism গ্রন্থের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ করে রচিত হয়েছে বর্তমান পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ। ওই পরিচ্ছেদের নিন্দা প্রশংসা আমাদের প্রাপ্য নয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে ভারতে ইসলামী মৌলবাদের ইতিহাস। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে তিতুমীর সমকালে গ্রাম বাংলার সামাজিক পরিবেশ—যে পরিবেশে উদ্ভব ঘটেছিল তিতুমীরের। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে তিতুমীরের আন্দোলন, শহীদত্ব ও উত্তরকথা।

সুতরাং পুস্তকের শীর্ষনাম 'নবরূপে তিতুমীর' হলেও প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও ইসলামী মৌলবাদের পটভূমিকায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলনই

বিবৃত হয়েছে এই পুস্তকে। তিতুমীরের জেহাদ সেই জেহাদী ও পূর্ণ ইসলামায়ণবাদী আন্দোলনের অংশ বিশেষ।

তিতুমীরের প্রথম জীবনীকার বিহারীলাল সরকার[0.1] তিতুমীরকে 'ধৰ্ম্মোন্মাদ' আখ্যাতে আখ্যাত করলেও পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজনে তিতুমীরকে 'হিরো' বানানো হয়। যতদূর জানা যায় এই অপকর্মটি করেছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।[0.2] সেকুলার বুদ্ধিজীবিরা জেহাদী তিতুমীরকে 'কৃষক' বিদ্রোহীতে রূপান্তরিত করেছেন আপন আপন মনের মাধুরী মিশায়ে। যার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নামমাত্রও নেই। ঔপনিবেশিক হীনমন্যতাযুক্ত এইসব সেকুলার ইতিহাসকারদের প্রেরণার উৎস কান্টওয়েল স্মিথ নামক এক শ্বেতাঙ্গের এক গ্রন্থ। এঁদের কাছে কোনও শ্বেতাঙ্গ ছাপার অক্ষরে মনোমত কিছু লিখলেই হলো। সেটাই হয়ে ওঠে ইতিহাস রচনার প্রাথমিক সূত্র। এই মানসিকতা থেকে মহাপণ্ডিত রামকৃষ্ণমিশন ভক্ত অমলেশ ত্রিপাটীও মুক্ত নন।[0.3] তিতুমীরের ইতিহাস বিকৃতির প্রসঙ্গে সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুপ্রকাশ রায়[0.4] ও অমলেন্দু দের রচনা।[0.5] নানা গালগল্পই এই দুজনের ইতিহাস রচনার সূত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিশুপাঠ্য 'নারকেলবেড়িয়ার লড়াই' রচিত হয়েছে সুপ্রকাশ রায়ের গুল্লোকে ভিত্তি করেই। বর্তমানে তিতুমীর সম্পর্কে আহরিত ঐতিহাসিক তথ্য প্রচুর। সেইসব তথ্য বিশ্লেষণ করে এই পুস্তকে দেখানো হয়েছে যে বিহারীলাল কথিত 'ধৰ্ম্মোন্মাদ' অভিধাই তিতুমীরের যথার্থ প্রাপ্য। সুতরাং আমাদের অবস্থান প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতে। বিহারীলালের যে চিত্র আবছা সেই চিত্রই নানা তথ্য ও কোরাণ হাদিশের ইসলামী তত্ত্বের সমন্বয়ে স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত হয়েছে এই পুস্তকে। সেই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাব ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলিম মানসের চিন্তাচেতনার বিবর্তনও।

ইসলামী তত্ত্বের জন্য প্রধানতঃ হরফ প্রকাশণীর কোরাণই ব্যবহৃত হয়েছে এই পুস্তকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনে সাহায্য নেওয়া হয়েছে, গিরীশচন্দ্র সেন, মহম্মদ পিক্থল বা এন. জে. দাউদের কোরাণও। হাদিশের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দিল্লীর কিতাব ভবন প্রকাশিত আবদুল হামিদ সিদ্দিকী অনূদিত 'সহী মুস্লিম' হাদিশই ব্যবহার করা হয়েছে।

এই পুস্তকে 'ধর্ম' শব্দটি ইংরেজী রিলিজিয়ন শব্দটির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ ভারতীয় ভাষাসমূহে ধর্মের একটি অর্থ হলো নৈতিকতা। আর নৈতিকতা ফলিত মানবিকতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সেজন্য এই পুস্তকে রিলিজিয়ন শব্দের প্রতিশব্দরূপে দ্বীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজী Fanatism শব্দটির সঠিক প্রতিশব্দ না পাওয়াতে মৌলবাদ শব্দটি প্রতিশব্দ রূপে শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—Fundamentalism শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে নয়। স্যায়িখ আহমদ শিরহিন্দী বা শাহ্ ওয়ালিউল্লাকে Fundamentalist আখ্যা দিলে উক্ত আখ্যাধারী উত্তর আমেরিকার নিরীহ খৃষ্টান সম্প্রদায়টিকে অকারণে অপমানিত করা হয় বলে আমাদের বিশ্বাস।

বর্তমানে ভারতের ছাত্রছাত্রীরা যে ইতিহাস পাঠ করে তা এক কথায় ভারতবিরোধী। এই ইতিহাসের প্রবর্তক মূলতঃ খৃষ্টানমনস্ক ইউরোপীয় ইতিহাসকাররা। এর মধ্যে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে আলিগড়ী ও জনু ধারা। এইসব ধারার ইতিহাসকাররা অত্যন্ত চতুরভাবে ভারতীয়দের

হীন প্রতিপন্ন করতে তৎপর। ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পঞ্চাশের দশকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন। পঞ্চাশের দশকের শেষে তিনি লিখেছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ ছেলে ভারত সম্বন্ধে নিরাগ্রহ এবং অল্প সংখ্যক পাকিস্তানী। যারা নিরাগ্রহ তাদের মধ্যে কয়েক জন ছাত্র (এবং শিক্ষক) হালকা রকমের পাকিস্তানী। নানা রকমে পাকিস্তানের ওপর এদের একটা আন্তরিক টান রয়েছে।

বর্তমান আলিগড়ী ধারার সূতিকাগার ধূর্জটিপ্রসাদের দেখা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং এই ধারা স্বাভাবিকভাবেই জাতীয়তাবিরোধী। এই জাতীয়তাবিরোধী ধারার বিপরীতে আমাদের ইতিহাস চর্চা। আমাদের প্রথম পুস্তক 'নবরূপে ডিরোজিও'তে এক ভারতীয় ইতিহাস রচনাপ্রণালী অনুসৃত হয়েছে। 'নবরূপে তিতুমীর' সেই একই ধারার অনুবর্তী।

এই পুস্তক পাঠ করে বঙ্গবাসীগণ তাঁদের অধিষ্ঠানভূমি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলে আমাদের শ্রম সার্থক বোধ করবো।

জানুয়ারী-১৯৯৬ গ্রন্থকার

এই লেখকের অন্য মিথভাঙ্গা গবেষণা

নবরূপে ডিরোজিও

১ / ইসলাম
শিয়া ও সুন্নী : শরিয়তী ও মারিফতী

আরবী ভাষায় ইসলাম কথাটির অর্থ আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণ যখন একেশ্বর আল্লাহর কাছে তখন আত্মসমর্পিত মানুষটির নাম মুসলমান এবং তার বিশ্বাস ও আচরণীয় কর্মসমুচ্চয়ের নাম ইসলাম।[১.১] আরবী ভাষায় ইসলামই হলো 'দ্বীন'। জাতি-গোত্র-ভাষা যাই হোক না কেন, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী মাত্রই মুসলমান—এই তত্ত্বের ভিত্তিতে ইসলাম আজ বিশ্বজুড়ে এক ব্যাপক ভ্রাতৃসংঘের সৃষ্টি করেছে। মুসলমানরা সংঘবদ্ধ হয়েছে আল্লাহ্ এবং তাঁর দূত হজরত মহম্মদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর বাণীকে কেন্দ্র করে।

পয়গম্বর বা 'আল্লাহর দূত' হজরত মহম্মদের জন্ম মক্কায়, ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল। মাতা আমিনা বিন্ত ওয়াহাব, পিতা কুরেশী বণিক উপজাতির হাশিম গোষ্ঠির আবদুল্লা। মক্কা ওই সময়ে পশ্চিম আরবের একটি বাণিজ্য ও তীর্থ নগরী, জনসংখ্যা পাঁচ হাজারের মত। তীর্থনগরীর কেন্দ্রবিন্দু একটি কালো ঘনাকৃতি মন্দির 'কাবা' ও তার অন্তঃস্থিত ছোট্ট একটি কালো পাথর—যেটি সম্ভবতঃ একটি উল্কাপিন্ড। এছাড়া ওই তীর্থ প্রাঙ্গণে ছিল ৩৬০টি ছোট বড় দেবদেবীর মূর্ত্তি। কোরাণে এরকম দশটি দেব-দেবীর উল্লেখ আছে। বহুশতাব্দী ধরেই যাযাবর আরব বেদুইনরা মূর্ত্তি উপাসক ছিল। বড় বড় গাছ ও পাথরকে পবিত্র জ্ঞান করে সেটিকে কেন্দ্র করে দেবস্থান প্রতিষ্ঠা করতো তারা। কাবা ছিল এমনই এক তীর্থস্থান।

তীর্থ ও বাণিজ্য নগরীর পরিবেশে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন মহম্মদ ইবন আবদুল্লা বা আবদুল্লাপুত্র মহম্মদ। পরিণত হলেন মধ্যম উচ্চতার এক সুগঠিত পুরুষে—যাঁর নাক পাখীর ঠোঁটের মত বাঁকানো, চোখ দুটো উজ্জ্বল আর বড় বড়, ঠোঁট জোড়া সুন্দর আর সুপুষ্ট। মাথার চুল ঘন আর কিঞ্চিৎ কোঁকড়ানো। আচারে আচরণে শান্ত, গম্ভীর ও অন্তর্মুখী মহম্মদের কথাবার্তা ছিল বাহুল্যহীন, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত।[১.১]

বয়স যখন তাঁর প্রায় চল্লিশ বছর তখন অন্তর্মুখী ও নীতিবান মহম্মদ প্রায়ই মক্কার নিকটবর্তী হেরা পর্বতের এক গুহার মধ্যে ধ্যানে বসতেন। এই রকম এক ধ্যানের মধ্যেই চল্লিশ বছর সাত মাস বয়সে তিনি শুনলেন দেবদূত জিব্রাইলের মারফৎ প্রেরিত দৈববাণী, মহম্মদ তুমি আল্লাহর দূত। ৬১০ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই রাতে তিনি প্রথম এই 'ওহী' বা প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এর পর দীর্ঘ ২০ বছরেরও বেশী সময় ধরে তিনি জিব্রাইলের মারফৎ সুললিত ছন্দবদ্ধ পদ্যে আল্লাহর প্রত্যাদেশ লাভ করতে থাকেন। শেষ প্রত্যাদেশ আসে তাঁর মৃত্যুর ন দিন আগে। এই সমস্ত প্রত্যাদেশ তাঁর অনুচরেরা সর্বদা লিখে রাখতে থাকেন তালপাতা, ইটের খড়, চামড়ার ফালি ইত্যাদিতে। এগুলি সংকলিত হয় ১১৪টি সুরা বা অধ্যায়ে, ৬৬৬৬টি শ্লোক বা আয়াতে। এই সংকলিত মহাগ্রন্থই 'কোরাণ'।

৬১৯ খৃষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে আল্লাহর বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। তিনি বলেন, সমস্ত পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে সর্বব্যাপী, বিশ্বজগতের প্রতিপালক,

পরম করুণাময়, নিরাকার আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করো। ধনী ব্যক্তিদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বললেন, তঞ্চকতা ও কৃপণতার সাহায্যে সঞ্চিত ধনরাশিই শেষ পর্যন্ত তাদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

যেহেতু মহম্মদ প্রচারিত একেশ্বরবাদের অবস্থান প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এবং মক্কার বহু বণিকের ব্যবসার প্রধান উৎস ছিল কাবা ভিত্তিক তীর্থক্ষেত্রের তীর্থযাত্রীদল, সেহেতু মক্কার বণিকসমাজ স্বাভাবিক ভাবেই বিরোধী হয়ে উঠলো মহম্মদের। মহম্মদের একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি একান্ত আত্মসমর্পণের তত্ত্বও বেদুইন সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠিপতিদের স্বার্থে আঘাত হানলো। কারণ, গোষ্ঠিপতিরা নিজেদের গোষ্ঠিভুক্ত মানুষের কাছে যে আনুগত্য দাবী করতো তা প্রায় দেব পূজার সমান। এছাড়া তাদের সঞ্চিত ধনসম্পদের প্রতি কটাক্ষও ছিল অসহ্য।[১.৩]

মহম্মদের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ ৬১৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এমনই একটা পর্য্যায়ে পৌঁছলো যে তার অনুগামীরা যত্রতত্র আক্রান্ত হতে লাগলেন। ৬২০ খৃষ্টাব্দে ইয়ারসব মরুদ্যানের খাজরাজ উপজাতির কয়েকজন আসেন কাবাতে তীর্থ করতে। অ্যারেমিয় ভাষায় ওই মরুদ্যানকে বলা হতো মেদিন্তা বা নগর। মেদিন্তা পরে পরিবর্তিত হয়ে মেদিনাত অল নবী বা স্রেফ মদিনা হয়। মদিনার বর্তমান অবস্থান মক্কা থেকে প্রায় তিনশো ষাট কিলোমিটার উত্তর পূর্বে। খাজরাজ উপজাতির ওই মানুষগুলি মহম্মদের সঙ্গে আলাপে প্রীত হয়ে ইসলাম দ্বীন গ্রহণ করলো। তারাই মদিনা ফেরার পথে আরও কয়েকজনকে দীক্ষিত করলো নতুন মতে।

পরের বছর খাজরাজ উপজাতির লোকগুলো আবার এলো মক্কায়। সঙ্গে নিয়ে এলো বেশ কয়েকজন নবদীক্ষিতকে। তাদের মধ্যে দুজন আবার আউস উপজাতির। এই আউস উপজাতির সঙ্গে খাজরাজ উপজাতির বহুদিন ধরে বিবাদ চলছিল মদিনায়। ৬২২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পঁচাত্তরজন মদিনাবাসী মুসলমানের সঙ্গে হজরত মহম্মদের একটি গোপন বৈঠক হলো। সেই বৈঠকে স্থির হলো মক্কার মুসলমানরা যদি মদিনাতে চলে যায় তবে মদিনাবাসীরা তাদের রক্ষা করবে। এরপরে কয়েক সপ্তাহ ধরে মক্কার মুসলমানরা ছোট ছোট দলে মদিনা চলে যেতে লাগলো। সবশেষে মদিনায় উপস্থিত হলেন হজরত মহম্মদ ও তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী আবু বকর।[১.৪]

মদিনাতে বিরোধরত আউস ও খাজরাজ উপজাতি লোকরা মধ্যস্থ হিসাবে মহম্মদকে বরণ করে নিল। উভয় উপজাতিই সম্পূর্ণ ভাবে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরে বিরোধের অবসান ঘটলো। এখন তারা সবাই আল্লাহ তে বিশ্বাসী। সুতরাং ভাই ভাই। ক্রমে ক্রমে মহম্মদ মদিনার সামরিক ও বেসামরিক শাসনকর্তা হয়ে উঠলেন।

ওদিকে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ নিয়মিতভাবে অবতীর্ণ (আরবী ভাষায় নাজিল) হতে লাগলো মহম্মদের কাছে। এখন সেগুলো আইনী ও নৈতিক নিয়মাবলীতে পূর্ণ, যা ছিল তৎকালীন মদিনাবাসীদের পবিত্র ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এছাড়া ছিল অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের হাত থেকে মদিনার ঐশ্লামিক উম্মা বা সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার প্রশ্ন।[১.৫]

তাই নাজিল হতে লাগলো:

"বিবাহ করবে স্বাধীনা নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা

তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে (ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধবন্দিনীকে)।[১.৬]

"মাতা পিতা এবং আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং নারীদেরও অংশ আছে। উহা অল্পই হোক আর বেশীই হোক।"[১.৭]

"নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জলন্ত আগুণে জ্বলবে।"[১.৮]

"এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু দুই এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর একমাত্র কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ।"[১.৯]

"তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজনের সাক্ষী নেবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করেন।[১.১০]

"তোমাদের মধ্যে যে দুজন এতে লিপ্ত হবে, তাদের উভয়কে শাস্তি দেবে। তবে যদি তারা তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয় তবে তাদের রেহাই দেবে।"[১.১১]

"তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগিনী, শ্বাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাঁর গর্ভজাত কন্যা, ... তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরসে জাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগিনীকে একসঙ্গে বিবাহ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১.১২]

"নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ...... উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থের বিনিময়ে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।"[১.১৩]

"কোনও বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোনও বিশ্বাসীর পক্ষে সঙ্গত নয়। ...... কেউ কোনও বিশ্বাসীকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে .... তার পরিজনবর্গকে রক্তার্পণ করা বিধেয়, যদি তারা ক্ষমা না করে।"[১.১৪]

"আর তাদের জন্য ওতে (তওরাতে) বিধান দিয়ে ছিলাম, যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম।"[১.১৫]

এছাড়া নাজিল হলো নানা আয়াত, যাতে ব্যক্ত করা হলো নানা নৈতিক ও আইনী বিধান: নিষিদ্ধ হলো মদ খাওয়া, জুয়া খেলা, মজুদদারী, শূকরের মাংস খাওয়া। ঘৃণিত হলো, জোচ্চুরী, নিন্দা, ভণ্ডামী, দুর্নীতি, বেহিসাবী খরচা, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, অহমিকা ও ঔদ্ধত্য।[১.১৬]

মদিনাতে হজরত মহম্মদ ইসলামী 'উম্মা' ও দার-উল-ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করলেন। ৬২৭ খৃষ্টাব্দে এক লিখিত দলিলে হজরত মহম্মদ বললেন: প্রথমতঃ ইসলাম বিশ্বাসীরা (মোমিনরা) এবং তাদের পরিজনেরা একটি সম্প্রদায় বা উম্মার অন্তর্ভুক্ত হলো। দ্বিতীয়তঃ উম্মার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠি তাদের সদস্যদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার দায়িত্বে থাকবে। তৃতীয়তঃ উম্মার সদস্যরা এককাট্টা থাকবে যাবতীয় অপরাধের বিরুদ্ধে। কোনও নিকট আত্মীয় অপরাধে অভিযুক্ত হলেও কোনও নমনীয়তা দেখাবে না। চতুর্থতঃ উম্মার সদস্যরা অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও শান্তিতে সর্বদা সংঘবদ্ধ থাকবে। শেষতঃ উম্মার সদস্যদের মধ্যে যদি কোনও কারণে মনোমালিন্য দেখা দেয় তবে ব্যাপারটা নিষ্পত্তির জন্য দাখিল করতে হবে আল্লাহ ও মহম্মদের নিকট।"[১.১৭]

কতকগুলি যুদ্ধ জয়ের ফলে মহম্মদ তাঁর ঐশ্লামিক সাম্রাজ্য প্রসার করতে সক্ষম হলেন এবং ৬৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করলেন আদি আবাস মক্কা। কোরেশরা ধ্বংস হয়েঁ গেল; পতন ঘটলো মক্কার। কাবা শরীফে অবস্থিত তিনশো ষাটটি দেবদেবীর পাথুরে মূর্ত্তি তিনি উপড়ে ফেললেন বেদী থেকে। অবশিষ্ট ধৃত কোরেশরা সারিবদ্ধ ভাবে তাঁর সামনে দিয়ে অভিবাদন জানাতে জানাতে যেতে বাধ্য হলো। সেই বিখ্যাত কালো পাথরকে ছড়ি দিয়ে ছুঁয়ে মহম্মদ ধ্বনি দিলেন, আল্লাহ্ আকবর, ইসলামের চিরন্তন রণধ্বনি।''[১.১৮]

বহুঈশ্বরবাদী যাযাবরদের ধরে ধরে মুসলমান করার ফলে দিনে দিনে স্ফীত হতে লাগলো মুসলমানদের সংখ্যা। এছাড়া স্বেচ্ছায় আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশ থেকে দলের পর দল লোক এসে ঐশ্লামিক উম্মার অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য পয়গম্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলো। বলা বাহুল্য মহম্মদ সাদর অভ্যর্থনা জানাতে লাগলেন সেইসব মানুষদের।

এইভাবে, আরবদেশ ও আশপাশের অঞ্চলে ওই সময়ে বিরাজিত ইহুদীধর্ম ও খৃষ্টানধর্ম থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক ভাবে বিকশিত হতে লাগলো ইসলাম। যদিও ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের কথা বারবার উল্লিখিত হলো কোরাণে। ঐতিহাসিক বার্ণাড লুইয়ের মতে ইসলাম বিকশিত হলো একটি রাষ্ট্ররূপে, পয়গম্বর হলেন সেই রাষ্ট্রের সেনাপতি, রাজস্ব সংগ্রাহক, অধিকর্তা এবং প্রধান বিচারক। পক্ষান্তরে যীশু রাজত্ব ও ঐশ্বর্যের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রাখলেন। মনুষ্যজীবনের কর্তৃত্ব ন্যস্ত হলো দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের ওপর—গীর্জা ও রাষ্ট্র। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, দুটি প্রতিষ্ঠান কখনও একে অপরের সহায়ক, কখনও বিরোধী।''[১.১৯]

মহম্মদ উপলব্ধি করলেন, ইসলামী উম্মাকে চিরজীবি করার জন্য নবদীক্ষিতদের এমন কিছু আচার ব্যবহারে বেঁধে রাখা দরকার যেগুলি তাদের প্রাত্যহিক জীবনকে স্পর্শ করবে। নিত্যদিন স্মরণ করিয়ে দেবে তাদের দ্বীনানুগত্যকে। ফলে তিনি প্রবর্তন করলেন ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের: কলেমা, নমাজ, রোজা, জাকাত ও হজ।[১.২০]

কলেমা হলো ইসলামের মূল স্তম্ভ। একজন মুসলমানকে নিত্য উচ্চারণ করতে হয় কলেমা—লা ইলাহা ইলাল্লাহ্ মুহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন দেবতা নেই, মহম্মদ আল্লাহর দূত)। ইসলাম গ্রহণের জন্য কয়েকজন সাক্ষীর সন্মুখে উপরোক্ত কলেমা উচ্চারণ করাই যথেষ্ট।[১.২১]

নমাজ বা প্রার্থনা ব্যক্তিগত ভাবেই করা যায়। সংঘবদ্ধ ভাবে মসজিদেও করা যায়। তবে শুক্রবারের নমাজ সর্বসমক্ষে মসজিদে করাই বাঞ্ছনীয়। নমাজ যিনি পরিচালনা করেন তিনি মসজিদের ইমাম। সবাই একই সঙ্গে কোরাণের বিভিন্ন আয়াত উচ্চারণ করেন। নির্দেশ অনুযায়ী কখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কখনও ঝুঁকে, কখনও হাঁটু গেড়ে বসে। আবার কখনও মাটিতে শুয়ে পড়ে। ধনী, দরিদ্র, রাজা-ফকির নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের একই স্থলে একই সঙ্গে নমাজ পড়ার মধ্যেই নিহিত আছে ইসলামী সাম্যবাদ। কিছুক্ষণের জন্য হলেও সবাই সবাইকে আপন বলে ভাবতে পারেন। ফলে, তাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়। এছাড়া, সেনাবাহিনীর প্যারেডের মত সবাই একসঙ্গে উঠাবসার মধ্যেও এক ধরণের শৃঙ্খলা ও একাত্মতা গড়ে ওঠে। শুক্রবারের নমাজের শেষে ইমাম কিছু ভাষণ দেন। সেখানে দ্বীনীয় ব্যাপার ছাড়াও সমাজ ও রাজনীতির কথাও বলা হয়।[১.২২]

জাকাত হলো দান : গরীব দুঃখীদের, দেনদারদের, জেহাদের জন্য তহবিলে, ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য ও তীর্থ ভ্রমণ করার জন্য। একজন মুসলমানের আয়ের শতকরা আড়াই টাকা জাকাত করা বিধেয়।

রমজান মাসে মুসলমানরা রোজা বা উপবাস পালন করেন। খাদ্য পানীয় গ্রহণ বা রমণ কিছুই করেন না। সূর্যাস্তের শেষে রোজ উপবাস ভাঙ্গেন। এই উপবাসের মধ্যে নিহিত আছে মুসলমানের আত্ম-শৃঙ্খলা।

যাঁদের আর্থিক সামর্থ আছে তাঁরাই শুধু হজ্ব করতে পারেন। জেলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন হজ করা বিধেয়। হজ শুরু হয় কাবা প্রদক্ষিণ করতে করতে। প্রদক্ষিণ করতে করতে কাবার গায়ে লগ্ন পবিত্র কালো পাথরটিকে চুম্বন করাও বিধেয়। শেষ হয় মীনা নামক স্থানে পশু কোরবানী করে। এর মধ্যে আরাফাত ও মুজদিলফাতে নমাজও আছে। হজের মাধ্যমে ইসলামী উম্মা তাদের শক্তিশালী সামাজিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়। বর্তমানে প্রায় কুড়ি লক্ষ মুসলমান প্রতিবছর হজ করেন।

হজরত মহম্মদ ৬৩২ খৃষ্টাব্দে শেষবার কাবা দর্শনের পর হজের নির্দেশ দেন। ওই সময়ে তিনি ছিলেন ক্ষমতার শিখরে। আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ—দেশে বিদেশে সর্বাধিক সম্মানীয় দ্বীনগুরু। বেদুইন উপজাতির মানুষেরা—যারা একদা নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে করে মরতো তারা এখন ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত। তবুও অশেষ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহম্মদ বুঝেছিলেন, মদিনা ভিত্তিক দার-উল-ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায়, অবিরাম যুদ্ধের মাধ্যমে তার দৈহিক প্রসারণ। এই প্রসারণ যুদ্ধই জেহাদ। মহম্মদ জেহাদের মাধ্যমে ইসলামের প্রসারণের আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, এটা আল্লার পথে যুদ্ধ। ইসলামের এই প্রসারণ তত্ত্ব সহজেই আকৃষ্ট করলো বেদুইনদের। কারণ, যুদ্ধ ও লুটপাট করে আনা ধনের চার পঞ্চমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সৈন্যদেরই প্রাপ্য।[১,২৩]

হজ থেকে ফিরে মহম্মদ সিরিয়া আক্রমণের জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বল্প কাল রোগ ভোগের পর জীবনাবসান ঘটলো তাঁর। দিনটা ৮ই জুন, ৬৩২ খৃষ্টাব্দ। মহম্মদের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। সুতরাং পক্ষকাল ব্যাপী অসুস্থতার সময় তাঁর উত্তরসূরী নিয়ে সহচরদের মধ্যে বিবাদ লেগে গেল। উত্তরসূরীর দাবীদার ছিলেন প্রধানতঃ দুজন—মহম্মদের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েষার পিতা আবু বকর এবং মহম্মদের খুল্লতাত ভ্রাতা এবং কন্যা ফতিমার স্বামী, আলি ইবন আবু তালিব। আবু বকরকে মহম্মদ নমাজ পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন। আর তেত্রিশ বছর বয়স্ক আলি পেয়েছিলেন তাঁকে স্নান করাবার ভার। যখন আলি ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা মহম্মদের দেহ কবরস্থ করার কাজে ব্যস্ত তখন আনসার নামধেয় মদিনার মুসলমানরা উত্তরসূরী নির্বাচনের জন্য সাদা-বানু-সকিফাতে একটা সভা ডেকে বসেছে। সংবাদ পেয়ে আবু বকর এবং মহম্মদের অন্য এক স্ত্রী হাফসার পিতা উমর ইবন খাত্তাব ছুটে গেলেন সকিফার সভাতে। ওদিকে সভাতে আনসাররা প্রায় ঠিক করেই ফেলেছে, একজন মদিনীয় মুসলমানই হবে মহম্মদের উত্তরসূরী। এমন সময় আবু বকররা উপস্থিত হয়ে বললেন, কোরেশ উপজাতির একজনই মহম্মদের উত্তরসূরী হবার যোগ্য। মদিনাবাসীরা আবু বকরের যুক্তি মেনে নিলেন। ওই সভাতে বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং মহম্মদের চিরকালীন সহচর আবু বকরকেই উত্তরাধিকারী

নির্বাচিত করা হলো। তাঁর উপাধি হলো খলিফা। দু বছর পরে আবু বকরের জীবনাবসান ঘটলো। মৃত্যুর আগে আবু বকর উমর ইবন খাতাবকেই পরবর্তী খলিফা পদে নির্বাচিত করলেন। সবাই সেটা মেনেও নিলেন। মনে মনে মানলেন না কেবল একজন, তিনি আলি। আলি নিজেকে জনজীবন থেকে গুটিয়ে নিলেন। শিক্ষাকর্ম ও কোরাণের প্রামাণ্য সংস্করণ রচনার কাজেই ব্যাপৃত রাখলেন নিজেকে।[১.২৪]

৬৩৬ খৃষ্টাব্দে উমরের সৈন্যদল সিরিয়ার বাইজ্যান্টাইন শক্তিকে পরাস্ত করলো। পরের বছর ইউফ্রেতিস নদীর তীরে ক্বাদিশিয়াতে পরাজিত হলো সাসানীয়রা। ইসলামের দখলে গেল আজকের ইরাক ও ইরাণের কিয়ৎ অংশ। চার বছর পরে উমরের সৈন্য দল মিশর দখল করলো। এইভাবে একের পর এক সুপরিকল্পিত জেহাদে বিস্তৃত হলো দার-উল-ইসলাম। দার-উল-ইসলামের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে উমর কঠোর ঐস্লামিক অনুশাসনের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ করতে লাগলেন মুসলমান সমাজ ও সৈন্যদলকে। তিনি জয়ী সৈন্যদলকে নিষেধ করলেন অধিকৃত অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করতে। তিনি অধিকৃত অঞ্চলের ভূমধ্যকারী ও সাধারণ মানুষকে করের আওতার মধ্যে আনলেন। এবং সেই কর দিয়ে সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত সৈন্যই ছিল আরবী। সৈন্যদের তিনি আবদ্ধ রাখলেন মসজিদ ও ইমাম সম্বলিত ছোট ছোট সেনা ছাউনীর মধ্যে। অধিকৃত অঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করা নিষিদ্ধ হলো তাদের।[১.২৫]

জনমানসে উমরের এইসব অনুশাসন ভীতির সঞ্চার করলো। মহম্মদ ও আবু বকরের অনুসরণে তিনি প্রধান বিচারকের পদও অলঙ্কৃত করতেন। যদিও তিনি যথেষ্ট বিবেকবান মানুষ ছিলেন, তবুও বিচারক হিসাবে তাঁর যাবতীয় রায় স্বাভাবিকভাবেই ত্রুটিমুক্ত ছিল না। প্রায়ই আলি তাঁর বিচারের ভুলত্রুটি ধরতেন। এরকম একটি বিচারের রায় ফিরোজ নামে এক ইরানী ক্রীতদাসকে এতই ক্ষিপ্ত করে তুললো যে ৬৪৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে উমরকে হত্যা করে বসলো সে। মৃত্যুশয্যায় উমর ছজনের একটি নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান গড়ে দিলেন। ওই প্রতিষ্ঠানে রইলেন পূর্বকথিত আলি এবং মহম্মদের অন্য দুই কন্যা রোকেয়া ও কুলসমের স্বামী উসমান ইবন আফান। উসমান ছিলেন কোরেশ উপজাতির উম্মায়েদী গোষ্ঠির লোক। খলিফার পদ সর্তাধীনে আলির কাছে প্রস্তাবিত হলো। সর্তগুলো হলো, আলিকে কোরাণ এবং হজরত মহম্মদের জীবনাদর্শ ও মতাদর্শ যা 'সুন্না' নামে পরিচিত তার দ্বারা এবং পূর্ববর্তী খলিফাদের কাজকর্মের নজির অনুযায়ী চলতে হবে। আলি কোরাণ ও সুন্না মেনে চলতে রাজী হলেও পূর্ববর্তী খলিফাদের নজির মানতে অস্বীকার করলেন। ফলে তিনি খলিফাপদ পেলেন না। অন্যদিকে উসমান সবকিছু মেনে নিতে রাজী হলেন। ফলে তিনিই হলেন দার-উল-ইসলামের পরবর্তী খলিফা।

উসমানের খলিফাপদ প্রাপ্তির ফলে অবশ্যম্ভাবী ভাবে দার-উল-ইসলামে উপ্ত হলো বিভেদের বীজ। একদিকে রইলো হাশিমী গোষ্ঠি। অপরদিকে উম্মায়েদী গোষ্ঠি। পরম আদর্শবাদী আলি হলেন বিরুদ্ধ মতবাদের নেতা। এদিকে উসমান কাঁচাখোলাভাবে স্বজনতোষণ শুরু করলেন। বড় বড় পদে নিয়োজিত হতে লাগলো কেবলমাত্র উম্মায়েদীরা। উসমান উমরের নীতিরও পরিবর্তন ঘটালেন। ইউফ্রেটিস নদীর উর্ব্বর অববাহিকাতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য অনুমতি দেওয়া হলো আরবদের। ফলে দার-উল-ইসলামের নানা স্থানে ধনী জমিদার গজিয়ে উঠলো। দিনে দিনে ধনী হতে লাগলো উম্মাইদরা। ফলে নানাদিকে অসন্তোষের সৃষ্টি হলো। অল্প বেতনের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলো সৈন্যরা। তারা আগের

মত লুণ্ঠিত দ্রব্যের চার-পঞ্চামাংশ দাবী করলো—যা উমর রহিত করে পরিবর্তে নির্দিষ্ট বেতনের বন্দোবস্ত করেছিলেন। এইভাবে নানারকম বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো আরবী মুসলমান সমাজ থেকে বসরা ও কুফার সেনাছাউনী পর্যন্ত। ৬৫৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ মিশর ও বসরা-কুফা থেকে একদল বিদ্রোহী সৈন্য আছড়ে পড়লো মদিনায় উসমানের প্রাসাদে। আলি বিদ্রোহীদের পক্ষে মধ্যস্থতার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হলেন। জুন মাসে একদল বিদ্রোহী সৈন্য উসমানের প্রাসাদ আক্রমণ করে তাঁকে নিহত করলো। আলি উসমানের খুনকে ধিকৃত করলেও হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিলেন না। সৈন্যরা 'সেরা মুসলমান' আলিকে খলিফা বলে ঘোষণা করলো এবং সমস্ত মদিনাবাসীরা তা মেনেও নিল। সুতরাং প্রায় ২৪ বছর পরে আলি তাঁর প্রার্থিত পদটি পেলেন। কিন্তু পেয়েও আলি তেমন কিছু পেলেন না। কারণ, বিভেদের কালো মেঘে ইতিমধ্যেই আবৃত দার-উল-ইসলামের আকাশ। আলির সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হতে লাগলো অসন্তোষ দমনে।

ওদিকে সিরিয়ার উম্মায়েদী শাসক মুওয়াইয়া ইবন আবু সুফিয়ান আলির খলিফাপদ প্রাপ্তি মেনে নিলেন না। মুওয়াইয়া আয়েষার ভগ্নিপতি। তিনি দাবী করলেন, উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে হবে। হত্যাকারীদের বক্তব্য ছিল যেহেতু উসমান কোরাণের অনুশাসন অনুযায়ী কাজ করছিলেন না সেহেতু উসমান উম্মার সদস্য নয়। উম্মা থেকে বেরিয়ে যাওয়া মুসলমানকে হত্যা করাই বিধেয়। শুধু মুওয়াইয়া নয় বিবি আয়েষাও উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তির আবেদন জানালেন। তিনি বসরাতে চলে গিয়ে সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করে আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। আলি চলে গেলেন কুফায়, তাঁর সমর্থকদের ডেরায়। বসরার কাছে ৬৫৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর এক যুদ্ধে আলি পরাস্ত করলেন আয়েষার সৈন্য বাহিনীকে। কিন্তু পয়গম্বরের বিধবাকে অসম্মান করলেন না দ্বীন বিশ্বাসী আলি। বিভিন্ন সেনাদলের অধিপতিরা তখন আনুগত্য স্বীকার করলো আলির।[১.২৬]

৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ইউফ্রেটিশ নদীর তীরে আলি ও মুওয়াইয়ার সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হলো। আলির সৈন্যদল অবশ্যই উন্নততর শক্তি প্রদর্শন করলো এই যুদ্ধে। কিন্তু ছলনার আশ্রয় নিল মুওয়াইয়া। তরবারীর ডগায় কোরাণের পাতা লটকে আলিকে বাধ্য করলো যুদ্ধ থামাতে। আলি ও মুওয়াইয়ার বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্থির হলো দুজনে দুজন মধ্যস্থ নিয়োগ করবে, যারা খলিফা পদের দাবীদার দুজনের যুক্তি শুনে খলিফা নির্বাচিত করবে।

মধ্যস্থ নিয়োগের প্রস্তাবে আলির কয়েক শো সৈন্য বিরোধীতা করলো। কারণ, কোরাণে এ ধরণের মধ্যস্থতার কথা লেখা নেই। এছাড়া তারা বললো, যে কোনও ধার্মিক মুসলমানই খলিফা হবার যোগ্য। বিদ্রোহী সৈন্যদল আলিকে পরিত্যাগ করে বাগদাদে গিয়ে ঘাঁটি গড়লো। এই সৈন্য দল খারাজী বা বিচ্ছিন্ন বলে ঘোষিত হলো। আলি ৬৫৮ খৃষ্টাব্দে খারাজীদের পরাস্ত করলেন।[১.২৭]

এদিকে মধ্যস্থতার সময় আলির নির্বাচিত বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজের বক্তব্য বলার পরই মুওয়াইয়ার নির্বাচিত মধ্যস্থ ব্যক্তি মুওয়াইয়াকে খলিফা বলে ঘোষণা করলো। ফলে গন্ডগোলের মধ্যে সভা ভন্ডুল হয়ে গেল। আলি তাঁর খলিফাপদ ছাড়লেন না। ইসলামীর উম্মা স্পষ্টতঃ দুভাগ হয়ে গেল। একদিকে রইলেন আয়েষা-মুওয়াইয়া প্রমুখ উম্মায়েদীরা, অন্যদিকে রইলেন শিয়াত আলি বা আলির অনুগামীরা, যাঁরা আদতে হাশিমী গোষ্টির। বর্তমান আয়েষার অনুগামীরা সুন্নী এবং আলির অনুসরণকারীরা শিয়া বলে পরিচিত।

এদিকে ইবন মুজলাম নামে এক খারাজী ৬৬১ খৃষ্টাব্দে মার্চে কুফার মসজিদে নমাজরত আলিকে ছুরিকাঘাতে নিহত করলো। আলির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দার-উল-ইসলামের শক্তিকেন্দ্র মদিনা থেকে স্থানান্তরিত হলো অন্যত্র। মুওয়াইয়া জেরুজালেমে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। আলির জ্যেষ্ঠপুত্র হাসান নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করলেন কুফাতে। ধনী উম্মাইদ গোষ্ঠির মুওয়াইয়ার শক্তি অচিরেই বৃহত্তর বলে পরিগণিত হলো। মুওয়াইয়ার দূত গেল হাসানের কাছে। খলিফা বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে মাসিক অনুদানের ভিত্তিতে মদিনায় এসে বসবাস করুক হাসান; নতুবা .....! পরিবর্তে মুওয়াইয়া আশ্বাস দিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর খলিফার শিরোপা হাশিমী গোষ্ঠির ওপরই বর্তাবে। হাসান ব্যাপারটা মেনে নিলেন।

কিন্তু ৬৬৯ খৃষ্টাব্দে বিষ প্রয়োগ মৃত্যু ঘটলো হাসানের। মুওয়াইয়াও তাঁর পুত্র এজিদকেই পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত করলেন। ৬৮০ খৃষ্টাব্দে মুওয়াইয়ার মৃত্যুর পর এজিদ খলিফা পদে বৃত হলেন। কিন্তু শিয়ারা হতবল হলেন না। কারণ, তাঁদের পিছনেই রইলো জনসমর্থন। তাঁরা পয়গম্বরের যথার্থ বংশধর। শিয়ারা বললেন, আলির বংশধররাই একমাত্র উম্মার নেতা হবার উপযুক্ত। তাঁরা নেতার বিশেষণরূপে খলিফার বদলে ইমাম শব্দটি ব্যবহার করলেন। তাঁরা বললেন, ইমামরা অভ্রান্ত, কারণ আল্লাহ্‌র দ্বারা প্রভাবিত। অপরপক্ষে উম্মাইদরা, যাঁরা নিজেদের সুন্নি বা অহল-অল-সুন্না বলে পরিচয় দিতে লাগলেন, তাঁরা বললেন, খলিফাদের পক্ষেও কোরাণের ব্যাখ্যায় ভুল হতে পারে, তাঁরা অভ্রান্ত নয়। সুন্নিরা মহম্মদ ও পরবর্তী চার খলিফাকে স্বীকার করে। শিয়ার স্বীকার করে মহম্মদ ও আলিকে। কিন্তু কোরাণ ও মহম্মদের ব্যক্তিজীবন ও বক্তব্য—যা হাদিশ নামে কথিত তা উভয় শ্রেণীর মুসলমানই স্বীকার করে। কোরাণ ও হাদিশের বাণী একত্রে শরিয়ৎ নামে পরিচিত।

এজিদের খলিফাপদ গ্রহণের সংবাদ আলির অপর পুত্র হুসেন মদিনাতে বসে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারলেন না। তাঁকে বহুলোক সমর্থনও জানালো। বিশেষ করে কুফার মানুষেরা। হুসেন চলে গেলেন কুফার দিকে। সংবাদ পেয়ে এজিদ তাঁর দূত উবায়দুল্লা ইবন জিয়াদকে কুফায় পাঠালেন সেখানকার মানুষদের বশ করার জন্য। উবায়দুল্লা ঠাণ্ডা-গরম নীতি প্রয়োগ করে এজিদ-বিরোধী শক্তিকে প্রশমিত করলেন। ততো দিনে সরলমনা হুসেন সপরিবারে, মাত্র চল্লিশজন অশ্বারোহী ও বত্রিশজন পদাতিক নিয়ে, দক্ষিণ ইরাকের দিকে চলেছেন।

মহরম মাসের এক তারিখে—সঠিক ভাবে বলতে গেলে ৬৮১ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে কুফা থেক ৪৮ কিলোমিটার দূরে কারবালার প্রান্তরে এজিদের দারুণ ভাবে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ৪০০০ সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হলেন সপরিবারে হুসেন ও তাঁর বাহাত্তর জন সৈন্য। আটদিন ধরে নিশস্ত্র অবরোধ চললো; হুসেনকে বলা হলো নিঃসর্তে আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু হুসেন অবিচল তাঁর খলিফাপদের দাবীতে। যদিও জানতেন, পরাজয় ও মৃত্যু তাঁর অবধারিত। যুদ্ধে একে একে হত হলেন হুসেনের বাহাত্তর জন অনুচর। শেষে হুসেনও। সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে বেঁচে রইলেন শুধু তাঁর পুত্র জয়নাল আবেদিন ও পৌত্র মহম্মদ-অল-বকির। হুসেনের কাটা মুন্ড উপহার দেওয়া হলো এজিদকে।[১.২৮]

কিন্তু হুসেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্ব শেষ হলো না। কারণ, হুসেন যে হজরত মহম্মদের প্রকৃত বংশধর এই বোধ প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে পোক্তভাবে গাঁথা। ফলে এজিদ বাধ্য হয়েই হুসেনের পুত্র-পৌত্রদের মদিনাতে আশ্রয় দিলেন। হুসেনের বোন জৈনব শিয়াদের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন।

উম্মায়েদী রাজত্বে বিরোধী গোষ্ঠি রূপে বিরাজ করতে লাগলো শিয়ারা।

ইমাম হুসেনের শহীদত্ব ইসলামের ইতিহাসে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, এ শুধু হাশিমী-উম্মায়েদীদের যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধ দুর্নীতি পরায়ণ এজিদের সঙ্গে আত্মমর্যাদা সচেতন পুণ্যবাণ হুসেনের সংঘর্ষ। পূর্বে সংঘটিত হওয়া উসমান ও আলির যুদ্ধেরই এক সংস্করণ। দ্বন্দ্ব উম্মায়েদী বা হাশিমীভিত্তিক ইসলামের সঙ্গে বাস্তব ইসলামেরও বটে। মুসলমানরা কাকে মানবে? হাশিমীদের, উম্মায়েদীদের, না শুধুমাত্র শরিয়ৎকে? বাস্তব জীবনের উত্তর হলো, সব কিছুর সংমিশ্রণকে। সেই দ্বন্দ্ব আজও চলেছে। পয়গম্বরের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে অনবরত বোঝাপড়া চলছে; বোঝাপড়া চলছে অনাবিল ইসলামের সঙ্গে মানবিকতা ও জীবনের বাস্তব সত্যের।[১.২৯]

খৃষ্টীয় ৬৬১-৭৫০ অব্দ পর্যন্ত দার-উল-ইসলাম শাসিত হয়েছিল উম্মাইদদের দ্বারা। উম্মাইদ যুগ ছিল ইসলামের প্রসারণের যুগ। তারপর এলো আব্বাসীয় যুগ—দার-উল-ইসলামকে দৃঢ়ভূমিতে প্রোথিত করার পর্যায়। উম্মাইদরা আরব সৈন্যদের বিজিত জাতির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করেই রাখতেন। সৈন্যবাহিনী থাকতো ছাউনীর মধ্যে আবদ্ধ। তারা অ-আরবীয় নারীদের সঙ্গে সংসর্গ করতে পারতো না।[১.৩০]

ইহুদী অধ্যুসিত 'খাইবার' জেতার পর মহম্মদ জিজিয়া করের প্রবর্তন করেন। এই প্রথা অনুযায়ী কাফেরদের হত্যা না করে প্রচুর করের বিনিময়ে তাদের জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া হতো। করের বোঝার ফলে এবং স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা নির্বাহ করতে না পেরে বাধ্য হয়েই কাফেররা ইসলাম গ্রহণ করতো শেষ পর্যন্ত। উম্মাইদরা সবসময়ে বিজিত জাতির ওপর জিজিয়া কর বসাতেন। ফলে বিজিত জাতিরা ক্রমাগত ইসলামায়িত হতে থাকে। এইসব অ-আরবী দীক্ষিতরা পরিচিত হতো মাওয়ালী নামে। ক্রমাগত ইসলামায়িত হওয়ার ফলে আরবী ও মাওয়ালী মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্যও মুছে যেতে লাগলো। আরবের বেদুইন উপজাতিদের সাধাসিধা জীবন মিশ্রিত হলো ইরাণ ও মেসোপটেমিয়ার জটিল ও সুনিয়ন্ত্রিত কৃষিভিত্তিক জীবনের সঙ্গে। উম্মায়েদী খলিফারা গ্রহণ করলেন তাদেরই দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাইজ্যান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যের নানা নিয়মকানুন। এতে সাবেকী মুসলমানরা অবশ্যই কিছুটা ক্ষুব্ধ হলো। আবার উম্মাইদরা বিজিত দেশের অধিবাসীদের জোর করে ইসলামায়িত করার ফলে ইসলাম প্রসারিত হলো অ-আরব দেশের দূরতম প্রান্তের কৃষকদের মধ্যেও। ফলে সম্প্রসারিত দার-উল-ইসলামের প্রয়োজন হলো একটি সুসংস্কৃত আইন ও প্রশাসন পদ্ধতির। উম্মাইদরা স্পষ্টতই ব্যর্থ হলেন এই প্রয়োজন মেটাতে। ফলে পরে যখন উম্মাইদ-আব্বাসীয় সংঘর্ষ হলো তখন ইসলামী তত্ত্বজীবিরা আব্বাসীয়দের পক্ষই অবলম্বন করলেন।[১.৩১]

ক্ষমতা দখলের পর প্রথমদিকে আব্বাসীয়রা একটি নতুন মুসলমান সমাজের গঠন এবং সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়করণের দিকেই মনোনিবেশ করলেন। এটি একটি কঠিন দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পূরণের জন্য আব্বাসীয়গণ প্রায় দুশো বছর সময় নিলেন। এবং স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্বগুলি পালন করলেন বুদ্ধিজীবীরা। তাঁরা দেখলেন কোরাণের ৬৬৬৬টি আয়াতের মধ্যে মাত্র ৮০টি আয়াত আইন-কানুন সংক্রান্ত। এবং সেগুলির বিষয়বস্তু, নারী, বিবাহ, পরিবার এবং উত্তরাধিকার। কিন্তু যেহেতু মহম্মদ একটি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন সেহেতু

তাঁর মুখ দিয়ে প্রশাসন ও বিচার সংক্রান্ত অনেক কথাই উচ্চারিত হয়েছিল। পয়গম্বরের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত বাণী সংকলিত হয়েছে এবং সেগুলি সুন্না নামে পরিচিত। সবচেয়ে নামী সংকলন মহম্মদ-অল-বুখারীর (৮১০-৮৭০)। ফলে যা দাঁড়ায় সংক্ষেপে তা হলো, কোরাণ আল্লাহর বাণী এবং সুন্না হলো কোরাণের ব্যাখ্যা।

এই কোরাণ ও সুন্নাকে ভিত্তি করেই ইসলামী আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করেন এক ইরানী বণিক আবু হানিফা অল নুমাণ (৬৯৯-৭৬৭)। তাঁর মাদ্ধব বা আইনী মত আব্বাসীয়রা গ্রহণ করে। পরে মালিক ইবন আনাস (৭১৪-৯৬) নামক মদিনার এক উকীল দ্বিতীয় একটি আইনী মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন। হানাফী মত উদার এবং শহরে সাধারণ সমাজের পক্ষে গ্রহণীয়। কিন্তু মালিকী মত অনুদার এবং মৌলভী সম্প্রদায়ের পক্ষেই একমাত্র গ্রহণীয়। কিন্তু কায়রোর বাসিন্দা এবং আনাসের শিষ্য মহম্মদ ইবন ইদ্রিশ সফি (৭৬৭-৮২০) যে মত উচ্চারণ করেন সেটিই আব্বাসীয় খলিফাদের সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে। তিনি ফিক বা ইসলামী স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করেন চারটি স্তম্ভের ওপর। সেই চারটি স্তম্ভ হলো, কোরাণ, সুন্না, সমাজের সর্বসম্মত মত বা ইজমা, সমান্তরাল যুক্তি বা কিয়াস। তবে ইজমা বা কিয়াস যেন কোরাণ বা সুন্নাবিরোধী না হয় তা দেখা কর্তব্য।

আর একটি মতবাদ উচ্চারণ করেছিলেন আহম্মদ ইবন হানবল (৭৮০-৮৫৫)। হানবলী মতে সব সমস্যার সমাধানই কোরাণ ও সুন্না থেকে পাওয়া যেতে পারে। নতুন কোনও স্মৃতিশাস্ত্রের প্রয়োজন নেই। হানবলের মৌলবাদী মত শুধুমাত্র আরব বেদুইনরাই গ্রহণ করেছিল।

পরের কয়েক যুগ ধরে দার-উল-ইসলামের সুন্নী দ্বীনবেত্তারা (উলেমারা) এই চারটি মতবাদের মাধ্যমেই সমস্ত তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান করেছিলেন। নতুন কোনও উদ্ভাবন যাতে এই অবস্থার বিপর্যয় না ঘটায় তার জন্য দশম শতাব্দীর পর থেকে উলেমারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে ইজতেহাদ বা সৃষ্টিধর্মী ব্যাখ্যা অবৈধ। এই সিদ্ধান্ত শেষপর্যন্ত ইসলামের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কারণ পৃথিবীর চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চার সুন্নী মতবাদ বিবর্তিত হলো না। ফলে শত্রুতা সৃষ্টি হলো অটোম্যান খলিফাদের ও ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে।

হানাফী মত প্রসারিত হলো পশ্চিম এশিয়ায়। মালিকী মত মদিনা থেকে বিস্তৃত হলো উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায়। সফিই মতবাদ মিশর থেকে পৌঁছিলো দক্ষিণ আরবে, সেখান থেকে মৌসুমী বায়ুর পথ ধরে পূর্ব আফ্রিকায় এবং সেখান থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ব্যাপ্ত হলো। হানবলী মত আবদ্ধ থাকলো আরবের মরুভূমিতেই। এই হানবলী মতবাদ থেকে পরে উদ্ভব হয়েছিল ওয়াহাবীবাদ।

কোরাণ, হাদিশ ও ফিক মিশ্রিত ইসলামী বিধানের নাম শরিয়ৎ। শরিয়ৎ একজন মুসলমানের জীবন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। ফিক মানুষের জীবনের সমস্ত কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করে সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। কিছু কর্ম অবশ্য পালনীয় বা ফর্জ। মুবা হলো যে সমস্ত কর্ম পালন করা ভাল। যেসব কর্ম সম্বন্ধে মতামত অস্পষ্ট সেগুলি ওয়াজিব। যে সব কাজ না করলেই ভাল সেগুলি মকরু। যে সব কাজ করা পাপ সেগুলি হলো মুফসিদ। আর যেসব কাজ করা একেবারেই নিষিদ্ধ সেগুলি হারাম। ফর্জ, ওয়াজিব, মুবা ইত্যাদি করণীয় কর্ম কিভাবে করতে হবে তারও ফিরিস্তি দেওয়া হলো ফিকে। ইসলামী

স্মৃতিশাস্ত্র মুসলমানদের, খাওয়া, পান করা, নিঃশ্বাস নেওয়া, স্নান করা, মূত্র ত্যাগ করা, মলত্যাগ করা, বায়ু নিঃসরণ করা, মিথুন করা, বমন করা, ক্ষৌরী করা ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিল। এছাড়া ফিক বিধান দিল সামাজিক আচরণেরও। সবকিছু বিধান পালন করা এতই কঠিন যে শত ইচ্ছা সত্ত্বেও একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের পক্ষেও যাবতীয় নির্দেশ মানা একরকম অসম্ভব। কিন্তু এর অন্য ফল হলো এইসব নির্দেশ মানার প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সাহারা মরুভূমির মরুদ্যানে বসবাসকারী একজন মুসলমানের সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একজন দ্বীপবাসী মুসলমানের বাহ্য আচরণের কোনও পার্থক্য থাকলো না।[১.৩২]

ইসলামায়ন অবশ্য সর্বত্র সমভাবে হলো না। ভ্রমণশীল একজন আরব দ্বীনপ্রচারক আফ্রিকার উপজাতি নেতাকে ইসলামায়িত করতে সুরু করলো ছোট্ট একটা উপহার দিয়ে। সেটা কোনও একটা কবচ বা রত্ন হতে পারে। পরে উপহারের মাত্রা বাড়লো। উপজাতি নেতা শেষ পর্যন্ত একদিন কলেমাও পড়লো। নেতার দেখাদেখি অন্যান্য সদস্যরাও পরে পরে পড়তে লাগলো কলেমা। এতৎসত্ত্বেও তাদের কাছে ফিক উপস্থাপিত হলো না। তাদের কাছে ফিক উপস্থাপিত হলো অনেক পরে — যখন তারা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ মানতে শিখলো। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে ইসলাম প্রচারিত হলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। সেখানে উপজাতি সংস্কৃতির পরিবর্তে প্রবলতর বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির সম্মুখীন হলো ইসলাম। ফলে সেখানকার মানুষ ধর্মান্তরিত হলেও পুরনো ধর্মীয় সংস্কৃতি এখনও ভোলেনি। ইসলামী দেশ হলেও ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়ায় হিন্দু সংস্কৃতি আজও বর্তমান।[১.৩৩]

যেসব সমাজে মূর্তিপূজা, ব্যক্তি পূজা ও প্রকৃতিপূজা ছিল, ইসলাম প্রচারিত হলো সেই সব সমাজে। যেমন, সপ্তম শতাব্দীর আরব বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর জাভাতে। ফলে মূর্তিপূজা, ব্যক্তিপূজা ও প্রকৃতিপূজা করে মানুষগুলো যে মানসিক তৃপ্তি লাভ করতো, সেই তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে রইলো। কারণ, ওই ব্যাপারগুলি ইসলামী মতে নিষিদ্ধ বা হারাম। তাছাড়া, কোরাণে আল্লার যে রূপ তাতে ভয় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হলেও ভালবাসা ও মমতার উদ্রেক হয় না। সুতরাং শুষ্ক ইসলামী অনুশাসন এইসব নবদীক্ষিতদের কাছে মোটেই সুখপ্রদ মনে হলো না।

হজরত মহম্মদ মাঝে মাঝে নির্জন গুহার মধ্যে উপাসনায় বসতেন। ইসলামে নবদীক্ষিতদের অনেকেও উপাসনাদিতে মেতে উঠলেন। তাদের বিশ্বাস জন্মাল যে জপধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহকে উপলব্ধি করা সম্ভব। এবং সমস্ত জাগতিক কাজকর্ম ও রাজনীতি আল্লাহ উপলব্ধির প্রতিবন্ধক। এইসব ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে তাঁরা শুষ্ক ইসলামের মধ্যে হৃদয়ের সঞ্চার করলেন।

এইসব উপাসকেরা সুফী নামে অভিহিত হতে লাগলেন। কারণ, তাঁরা প্রায়শই পশমের পোষাক পরে ঘুরে বেড়াতেন। আর, পশমের আরবী প্রতিশব্দ 'সুফ'। যেহেতু সুফীবাদের মূল কথা অন্তরের প্রেম দ্বারা আরাধনা করে আল্লাহকে খুশী করে তাঁরই মধ্যে নিজেকে বিলীন করা সেহেতু সুফী ইসলামের আরেক নাম মারিফতী ইসলাম। মহব্বৎ, এবাদৎ, রেয়াহৎ, ফানা ও তাঁবেদার শব্দ কটির আদ্য অক্ষর নিয়ে মারেফৎ শব্দটি গঠিত হয়েছে।

আমাদের জানা প্রথম সুফী ব্যক্তিটির নাম হাসান-অল-বসরী (মৃত্যু-৭২৮ খৃষ্টাব্দ)। ধীরে ধীরে সুফীবাদ অবলম্বনকারী দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হলো। শরা ও বেশরা। বেশরা সুফী অল হুসেন ইবন মনসুর হাল্লাজ (৮৫৭-৯২২) ঘোষণা করলেন, 'আনাল হক' (সংস্কৃত

সোহহম বা বাংলা 'আমিই সে') এবং তাকে আল্লাহ বিরোধী বলে হত্যা করা হলো। শরা সুফীদের মধ্যে সবচেয়ে নামজাদা হলেন আবু হামিদ অল গজলী (১০৫৮-১১১১) তাঁর মতে অতীন্দ্রিয়বাদ হচ্ছে একমাত্র পথ, যার দ্বারা আল্লাহকে উপলব্ধি করা যায়। যদিও এই পথে কোরাণ ও আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায় না। তিনি সুফী অতীন্দ্রিয়বাদকে শরিয়তের সঙ্গে সম্মিলিত করার প্রচেষ্টা চালালেন। সেই উদ্দেশ্যে লিখলেন এক মহাগ্রন্থ 'ইয়াহিয়া উলুম অল দ্বীন' বা দ্বীনবিদ্যার পুনঃজাগরণ। এই গ্রন্থ সুফীবাদের এক প্রামান্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়। এরপর বিভিন্ন সুফী সাধককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সুফী সিলসিলার সৃষ্টি হলো। যেমন কাদিরিয়া, নকশবন্দিয়া, বেতাক্ষী ইত্যাদি।

মধ্যদ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ, সুফীবাদ এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠলো যে দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো মূল শরিয়তী ইসলামের সঙ্গে তাকে পৃথক করা । সুফী সাধকেরা রাজনীতিতেও অংশ নিতে লাগলেন। অটোম্যান তুর্কীরা যখন ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করলেন তখন সেই অবরোধে অংশ গ্রহণ করলেন বেশ কিছু সুফী দরবেশও । ১৫০১ খৃষ্টাব্দে সফোভী সিলসিলার সুফীরা তাবির্জ দখল করে এবং ইরানের সাফাভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

ভারতবর্ষে হিন্দুদের সঙ্গে ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ হয় ৭১১ খৃষ্টাব্দে, যখন আরববাসী মহম্মদ-বিন-কাশিম সমুদ্রপথে সিন্ধু আক্রমণ করেন। পরে আফগান মুসলমান গজনীর মহম্মদ খাইবার গিরিপথ ধরে ভারত আক্রমণ করে পশ্চিম পাঞ্জাব দখল করেন। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রস্থলে সর্বপ্রথম ইসলামী রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন এক তুর্ক-আফগান, কুতুব-অল-দ্বীন-আইবক।

কিন্তু ভারতবর্ষে রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করলেও মুসলমানগণ হিন্দুদের ইসলামায়িত করার ক্ষেত্রে প্রথমদিকে তেমন সাফল্য-লাভ করেন নি। বহুক্ষেত্রে জিজিয়া কর আদায় করেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। কারণ ইসলামের সঙ্গে সনাতন ধর্মের আকাশ পাতাল পার্থক্য। ইসলামায়িতকরণের জন্য দুটি ধর্মের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। প্রধানতঃ কাদিরিয়া, চিস্তিয়া ও নকশবন্দিয়া সিলসিলার মারিফতী ইসলাম দুটি বিরুদ্ধ মতের মধ্যে রচনা করলো প্রাথিত সেতুটি। কাদিরিয়া সিলসিলার জন্ম বাগদাদে, নকশবন্দিয়া সিলসিলার জন্ম তাজিকিস্থান। দুটি সিলসিলাই অল আরাবীর (১১৬৫-১২৪০) অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরাবীর মতে আল্লাহ ও বিশ্বজগতের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি একই প্রপঞ্চের অন্তর্গত। মানুষ হচ্ছে অনুজাগতিক সত্তা যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ নিজের অনুধ্যান করেন। সুতরাং সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে দিব্যত্ব ও মানবিকতা—এই দুটি তত্ত্ব নিহিত। দিব্যত্ব হচ্ছে সৃষ্টির গুপ্ত তত্ত্ব। সৃষ্টির প্রকাশ্য তত্ত্ব হচ্ছে মানবিকতা।

ভারতের সুফী সাধকেরা আরাবীর তত্ত্বকে প্রসারিত করে বললেন, যেহেতু আল্লাহই একমাত্র সত্তা, সেহেতু অন্য সমস্ত ভৌত বস্তুগুলি 'উপস্থিতি' মাত্র। সেগুলি আল্লাহর ইচ্ছার রূপ বলেই ধরে নেওয়া যায়। এই মতবাদ শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ ও সনাতন অদ্বৈতবাদের খুবই নিকটবর্তী। সুতরাং এই পরিবর্তিত সুফীবাদ ভারতীয় জনগণকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে যথেষ্ট সমর্থ হলো। ফলে বেশ কিছু ভারতীয় ইসলামায়িত হলো এবং পূর্বপুরুষদের সংস্কারের সঙ্গে ইসলামের আচারগুলিকে মিশ্রিত করে পত্তন ঘটালো এক নতুন ভারতীয় ইসলামের।

সাধারণ বাঙালীর ধারণা সুফীবাদীরা শরিয়ৎ বিশ্বাসী নমাজ পরা মুসলমানদের থেকে পৃথক এক ধরনের সন্ত; প্রথাগত রোজা-নমাজ ইত্যাদি আচার আচরণ থেকে দূরবর্তী। অর্থাৎ যিনি মসজিদে নমাজ পড়তে যান তিনি সম্ভবতঃ ফুরফুরা শরীফে যান না, বা, যিনি আজমীর শরীফে যান তিনি সম্ভবতঃ জামা মসজিদে নমাজ পড়তে যান না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মোমিন মাত্রই কোনও না কোনও সুফী সাধকের (মুর্শেদের) শিষ্য (মুরিদ)। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের কাছে জামা মসজিদ ও আজমীর শরীফ সমান গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বতন সোভিয়েট রাশিয়ার এক বৃহৎ সংখ্যক নাগরিকই ছিলেন মুসলমান। নাস্তিক রাষ্ট্রে একদা মসজিদগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মুসলমানরা তাঁদের সত্তা বিসর্জন দেননি। আত্মরক্ষা করেছিলেন বাইরে মসজিদে না গিয়ে ঘরের মধ্যে সুফীবাদকে আশ্রয় করে। ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার পতনের ফলে দেখা দিয়েছে কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র।

ইসলামের উপরোক্ত বিবরণে জেহাদ ও দার-উল-ইসলামের কথা উচ্চারিত হয়েছে। বর্তমান পুস্তকের মূল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত তত্ত্ব দুটির কিঞ্চিৎ বিস্তৃতির প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে দার-উল-হরব সম্বন্ধে কিছু বলারও। নীচে তত্ত্ব তিনটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

দার-উল-ইসলাম[১.৩৪]

দার-উল-ইসলাম কথাটির অর্থ ইসলামের দেশ। 'রাদ্দু-উল-মুখতার' অনুযায়ী এটি হচ্ছে সেই দেশ যেখানে ইসলামী বিধান পুরোপুরি চালু হয়েছে। ইসলামের দেশে অ-মুসলমানদের জন্যে কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। তারা যদি পৌত্তলিক না হয় তবে নিজেদের রীতিনীতি অনুযায়ী ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারে। তবে তা অনাড়ম্বরের সঙ্গেই করতে হবে। গীর্জা বা সিনাগগ মেরামত করতে দেওয়া হলেও নতুন কোনও গীর্জা বা সিনাগগ নির্মাণ করতে দেওয়া হয় না। কারণ তা হাদিশ অনুযায়ী বেআইনী। দার-উল-ইসলামে পৌত্তলিকদের মন্দির অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। হানাফী আইন গ্রন্থ 'হেদাইয়া' অনুযায়ী, মুসলিম আইন জারী করা দেশে পৌত্তলিকতা সর্বশক্তি দিয়ে দমন করা বিধেয়।

দার-উল-হরব[১.৩৫]

দার-উল-হরব শব্দের অর্থ যুদ্ধের দেশ। 'ঘিয়াসুল লুঘাত' নামক অভিধান অনুযায়ী দার-উল-হরব অ-ইসলামায়িত দেশ। 'কামাস' অনুযায়ী দার-উল-হরব এমন এক দেশ যেখানে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় নি। 'ফতেয়া আলমগিরি' অনুযায়ী দার-উল-হরব দার-উল-ইসলামে পরিণত হবে যখন সেখানে ইসলামী বিধি-বিধান প্রবর্তিত হবে। আবু হানিফার মতে যে দেশে কাফেরদের বিধি-বিধান প্রবর্তিত রয়েছে কিন্তু দলিত হচ্ছে ইসলামের বিধি-বিধান সেই দেশই দার-উল-হরব।

জেহাদ[১.৩৬]

জেহাদ হলো ইসলামে অবিশ্বাসী বা কাফেরদের বিরুদ্ধে মোমিন বা ইসলাম বিশ্বাসীদের যুদ্ধ। এটি একটি কোরাণ ও হাদিশ নির্দেশিত অবশ্যকর্তব্য বা ফর্জ যা ইসলামের সম্প্রসারণের জন্য অর্থাৎ দার-উল-হরবকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার জন্য এবং মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতি দূর করার জন্য সংঘটিত হয়ে থাকে। কারণ, পৃথিবী থেকে পৌত্তলিকদের উৎখাত করে সারা বিশ্বে আল্লাহর দ্বীন প্রবর্তন করাই মুসলমানদের পরম কর্তব্য। এ সম্পর্কে কোরাণের আয়াত:

"এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না অধর্ম দূর হয় এবং আল্লাহর ধর্ম সামগ্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ......"[১.৩৭]

জেহাদে যোগদান করা মোমিনদের অবশ্য কর্তব্য বা ফর্জ হলেও ফর্জ দু ধরণের—ফর্জ-ই-আইন এবং ফর্জ-ই-কুফায়া। ফর্জ-ই-আইন মোমিনরা নিজেরাই সর্বদা মেনে চলবেন। কিন্তু ফর্জই কুফায়া ইমামের আহ্বান সাপেক্ষ। জেহাদ হচ্ছে ফর্জ-ই-কুফায়া। জেহাদের ডাক ইমামকেই দিতে হবে। আহ্বান জানানোর পরে জেহাদ ফর্জ-ই-আইনে পরিণত হবে। দার-উল-হরবে যে কোনও মসজিদের ইমাম বা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত যে কোনও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জেহাদের ডাক দিতে পারেন।

যখন একটি দার-উল-হরব মুসলিম শক্তি দ্বারা বিজিত হয় তখন ওই দেশের অধিবাসীদের তিনটি প্রস্তাব দেওয়া হয় তার কোনও একটি গ্রহণ করার জন্য:

(১) ইসলাম দ্বীন গ্রহণ করা—ইসলাম গ্রহণ করলে অ-বিশ্বাসীরা দেশের নাগরিক হয়ে যায়।

(২) জিজিয়া কর দেওয়া—জিজিয়া কর দিলে অ-বিশ্বাসীদের দেশে 'রক্ষিত' করা হবে। তারা পরিচিত থাকবে 'জিম্মি' বলে। জিম্মিরা অবশ্যই দেশের অধম নাগরিক।

(৩) তরবারীতে মৃত্যু—যদি না তারা জিজিয়া কর দিতে রাজী হয়।

সুফীদের মতে জেহাদ দু ধরণের—বড় জেহাদ ও ছোট জেহাদ। বড় জেহাদ হলো নিজের লালসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং ছোট জেহাদ হলো কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কোরাণে জেহাদকে বলা হয়েছে আল্লাহর পথে যুদ্ধ। জেহাদ সম্পর্কে কোরাণে নাজিল হওয়া ওহীগুলির কয়েকটি হলো:

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশবাদীদের (পৌত্তলিকদের) যেখানে পাবে বধ করবে। তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা (অনুতাপ) করে, যথাযথ নমাজ পড়ে ও জাকাত দেয় (দান করে) তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১.৩৮]

"যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ও পর কালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা নিষিদ্ধ করেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিজিয়া দেয়।"[১.৩৯]

"যারা বিশ্বাস করে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী তারা তাগুতের (কাবার দেবমূর্ত্তি) পথে সংগ্রাম করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, শয়তানের কৌশল দুর্বল।"[১.৪০]

"তুমি কি তাদের দেখনি যাঁদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর (যুদ্ধ বন্ধ কর) এবং যথাযথ ভাবে নামাজ পড় ও জাকাত দাও।' অতঃপর যখন তাদের যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো তখন তাদের একদল আল্লাহকে ভয় করার মত মানুষকে ভয় করছিল এবং তদপেক্ষা অধিক তারা বলছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? আমাদের কিছু দিনের জন্য অবকাশ দাও না?' বল, 'পার্থিব ভোগ সামান্য! এবং যে সংযমী তার জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।'"[১.৪১]

জেহাদ সম্বন্ধে হাদিশে বড় বড় পরিচ্ছেদ আছে। সামান্য দু-একটি হাদিশ হলো:

"হজরত আবু হুরাইয়া বলেন, রসলুল্লা বলিয়াছেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যাহার মুঠার মধ্যে আমার প্রাণ। আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হইল আমি আল্লার পথে নিহত হই, আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই, আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই, তার পরে ও পুনরায় জীবন লাভ করি, পরে পুনরায় নিহত হই।"[১.৪২]

"রসুলুল্লা বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মদকে (দঃ) রসুল হিসাবে সন্তুষ্ট চিত্তে মানিয়া লয়, তাহার জন্য জান্নাত অবধারিত।... [কিন্তু] এতদ্ভিন্ন আরো একটি বস্তু আছে, যাহার দ্বারা আল্লাহ তাহার বান্দাকে জান্নাতের মধ্যে আরও একশত সোপান বুলন্দ করিবেন এবং প্রত্যেক দুই সিঁড়ির ব্যবধান আশমান ও জমিনের দূরত্বের সমান। আবু সয়ীদ জানিতে চাহিলেন, ঐ বস্তুটি কী? উত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লার রাস্তায় জিহাদ! আল্লার রাস্তায় জিহাদ! আল্লার রাস্তায় জিহাদ!"[১.৪৩]

জেহাদের যোদ্ধাকে আরবীতে বলে মুজাহিদ। জেহাদে বিধর্মীর হত্যাকারী বা বিধর্মীর বিজেতাকে বলে গাজী এবং যে জেহাদী জেহাদ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে তাকে বলে শহীদ।

জেহাদে লুট করা সম্পত্তিকে বলে গনিমতের মাল। গণিমতের মালের মধ্যে বিধর্মীদের স্ত্রী-কন্যারাও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাদের হত্যা করা বিধেয় নয়। গণিমতের মালের ৪/৫ অংশ জেহাদীদের প্রাপ্য। লুট করা নারীদের বিবাহ না করে ভোগ করা ইসলাম সঙ্গত। এ সম্পর্কে কোরাণের আয়াত হলো:

"সধবা নারী অবৈধ কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার করিয়াছে তাহাকে তোমাদের সম্বন্ধে লিপি করিয়াছেন।"[১.৪৪]

২/ ভারতে ইসলামী মৌলবাদ

পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে কুতুব-অল-দীন আইবক ভারতের কেন্দ্রস্থলে সর্বপ্রথম একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন ওই দাস রাজবংশের পরে খলজী, তুঘলক এবং লোদী সুলতানেরা রাজত্ব করেন দিল্লীতে। তারপর ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন জহিরুদ্দীন মহম্মদ বাবর।

বাবরপূর্ব সমস্ত সুলতানেরা ইসলামকে রাজ্যের দ্বীন বলে স্বীকার করতেন। শরিয়ৎই ছিল দেশের আইন। অমুসলমানদের মধ্যে প্রবর্তিত ছিল জিজিয়া কর। শরিয়ৎ আদালতগুলির কাজকর্ম অবেক্ষণ করার জন্য এবং অন্যান্য ইসলামী বিধি-নিষেধ মানার জন্য সদর-উস-সদর ও দেওয়ান-ই-কাজাও নিয়োগ করেছিলেন সুলতানেরা। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও দেশ সত্যকারের দার-উল-ইসলাম হয়ে ওঠেনি। কারণ, সুলতানরা ছিলেন মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে অনায়াসে শরিয়ৎ অগ্রাহ্য করতেন তাঁরা। জিয়াউদ্দীন বারানী 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' তে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, সুলতানরা দুনিয়াদারী করলেও দ্বীনদারী করতেন না।[২.১] কারণ, সুলতানেরা বুঝেছিলেন রাজত্ব চালাতে গেলে পুরো শরিয়ৎ মানা সম্ভব নয়। টাকা ধার দিয়ে সুদ নেওয়াটা কোনও সুলতানই বেআইনী মনে করেননি। কারণ, বাস্তবতার খাতিরে সবাই বুঝেছিলেন, সুদের টাকার ওপরেই গোটা দেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল। তাছাড়া, পূর্ণ শরিয়ৎ ভারতের মত হিন্দু প্রধান দেশে অবাস্তব।

কিন্তু ইসলামী মৌলবাদীরা চিরকাল প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন পূর্ণ শরিয়ৎ বলবৎ করে সারা ভারতকে ইসলামী উম্মার অন্তর্ভুক্ত করতে। তাঁদের কাছে ইসলাম-ই একমাত্র সত্য। অন্য সব মতই মিথ্যা। সুতরাং পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও মতের স্থান নেই।[২.২] ইসলামের আগমনের আগে ভারত ছিল 'তমসাচ্ছন্ন'। সে কারণে সমস্ত ভারতবাসীকে ইসলামায়িত করাই একমাত্র বিহিত কাজ। সুতরাং যুগে যুগে ইসলামী মৌলবাদীরা সুলতানদের কাজে কর্মে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। সুলতানদের বিধান দিয়েছেন, কি করে হিন্দুদের আঘাত হানতে হবে।

সুখের কথা, একমাত্র আওরঙ্গজেব ছাড়া সব সুলতানই মৌলবাদীদের অল্প বিস্তর হতাশ করেছিলেন। তাদের সবচেয়ে বেশী হতাশ করেছিলেন জালালুদ্দিন মহম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৬)। কিশোর বয়সে কারারুদ্ধ হিমুকে হত্যা করে গাজী হলেও পরবর্তী যুগে এই মহান মোগল সম্রাট অনুধাবন করেন যে ভারতের মত হিন্দুপ্রধান দেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের অপমান ও উপেক্ষা করে সুষ্ঠভাবে রাজত্ব চালানো সম্ভব নয়। শরিয়তী বিদ্যাচর্চা না থাকার ফলে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ ক্রমশঃ মানবতাবাদী হয়ে ওঠেন ভারতের এই শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি ছিলেন চিস্তিয়া সুফীবাদ নামক এক বিশ্বমানবতাবাদী মতে বিশ্বাসী। রাজত্ব চালাবার জন্য সমস্ত মতাবলম্বীদের সঙ্গে সমভাবে আচরণ করতেন তিনি। তার রাজসভাতে সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাজা টোডরমল, মানসিংহ, রাজা রামদাস কাছোহা প্রভৃতি হিন্দুগণ।

অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্মানজনক অবস্থানের জন্য আকবর দশম শতাব্দীতে নিষিদ্ধ হওয়া ইজতেহাদের পুনঃপ্রবর্তন করলেন। তিনি নিজেই হলেন 'মুজতাহিদ' বা ইজতেহাদের অধিকারী।

ইজতেহাদের মাধ্যমে তিনি শরিয়তের সেই অংশ অমান্য করলেন, যেখানে বিধর্মীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করার নির্দেশ আছে। পূবর্তন সুলতানদের আমলে প্রচলিত জিজিয়া কর রহিত করে দিলেন তিনি। বিধান দিলেন, মুসলমানদের বিবাহ করার জন্য হিন্দু রমণীদের স্বধর্ম ত্যাগ করতে হবে না। নিজের রাজপুত স্ত্রী যোধাবাইকে তিনি প্রাসাদের মধ্যে স্বমতে পূজার্চনা করার অধিকার দিয়েছিলেন।[২৩]

সম্রাট আকবরের এহেন উদার মতবাদ সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় জনগণের কাছে তাঁকে জনপ্রিয় করে তুললো। মথুরায় বৈষ্ণবেরা তাঁকে অভিহিত করলেন জগৎ গোঁসাই বলে। গোঁসাই শব্দ বৈষ্ণবেরা ঈশ্বর অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু এই ঔদার্য আঘাত হানলো শরিয়ৎপন্থী মুসলমানদের মনে। এই সব মৌলবাদীরা ষোড়শ শতাব্দীর ভারতকে সপ্তম শতাব্দীর আরবে পরিণত করতে চাইতেন।

১৫৮১ খৃষ্টাব্দে আকবর ঘোষণা করলেন তাঁর নিজস্ব ধর্মমত দ্বীন ইলাহী। দ্বীন-ইলাহী ইসলামের সঙ্গে অন্য ধর্মের সংমিশ্রণ। এর ভিত্তি যুক্তি, মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতা। ভক্তি, পবিত্রতা, দয়া, ও আল্লাহর প্রতি আকুতিই দ্বীন-ইলাহীর মর্মবস্তু। এতে ঘৃণা করা হলো ইসলামী স্মৃতিশাস্ত্রের অন্ধ প্রয়োগকে। এই ইসলামী স্মৃতিশাস্ত্রই ইসলামী উম্মার মূলবস্তু। কিন্তু দ্বীন-ইলাহী কি মুসলমান কি অমুসলমান কারুর কাছেই গ্রহণীয় বলে প্রতিভাত হলো না—সম্রাটের সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও। কেবলমাত্র কয়েকজন পরিষদ সম্রাটের এই উদার মতবাদ গ্রহণ করলেন।

দ্বীন-ইলাহীর ঘোষণা যথেষ্ট কুপিত করলো ইসলামী মৌলবাদীদের। কারণ, ইসলামী বিধান অনুযায়ী প্রথমতঃ হজরত মহম্মদই শেষ পয়গম্বর—তাঁরপর আর কেউ পয়গম্বর হতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ ইসলামের সঙ্গে শরিয়ৎ বিরোধী কোনও উদ্ভাবন (বিদাৎ) মিশ্রণও ইসলাম বিরোধী বলে গণ্য।

এইসব মৌলবাদীদের নেতা ছিলেন নকশবন্দীয়া সুফী সাধক বাকি বিল্লা (১৫৫৩-১৬০৩)। বাকি বিল্লা আকবরের রাজসভার ও অন্যান্য স্থানের বিদ্বান ব্যক্তিদের চিঠি লিখে লিখে আকবরের দ্বীন-দ্রোহীতার কথা প্রচার করতেন। কিন্তু এর থেকে বেশী কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। মৌলবাদীদের এহেন আচরণ সত্ত্বেও আকববের রাজত্বে সম্প্রীতির এক মনোরম আবহাওয়া বিরাজ করতো। পরবর্তী যুগে আওরঙ্গজেবের বর্বর মৌলবাদী নীতিতে সম্প্রীতির সেই মানসিকতা যথেষ্ট নষ্ট হয়ে গেলেও সিপাহী বিদ্রোহের সময় সমবেত হিন্দুমুসলমান সিপাহী ও দিল্লীর জনগণ আকবরের বংশধর বাহাদুর শাহকে সম্মান-বশতঃ ভারতেশ্বর বলে দিল্লীর মসনদে বসান।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পরে সম্রাট নুর-উদ-দ্বীন মহম্মদ জাহাঙ্গীরের আমলে বাকি বিল্লার শিষ্য মুসলিম মৌলবাদী শ্রেষ্ঠ স্যাম্বিখ আহম্মদ শিরহিন্দী নিজেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিষ্ঠিত করে তোলেন। শিরাহিন্দী বললেন, আল্লাহ তাঁকে মুজাদ্দিদ আলফ-স্যানী বা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুক্তিদাতা করে ধরাধামে পাঠিয়েছেন। মুজাদ্দিদের জন্ম বর্তমান পাঞ্জাবের শিরহিন্দে। নকশবন্দীয়া সুফী পরিবারে জন্ম হলেও ইসলামী শিক্ষাদীক্ষার ফলে প্রথমাবধি মুজাদ্দিদের অনুরাগ ছিল কোরাণ ও হাদিশের প্রতি। হাদিশের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগই তাঁকে মৌলবাদী ও হিন্দু বিদ্বেষী করে তোলে।[২৪]

কুড়ি বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে আগ্রায় গেলেন মুজাদ্দিদ। কিন্তু সেখানকার বিদ্বৎ সমাজে তখন বিরাজ করছে আকবরী উদার হাওয়া। জ্ঞানান্বেষণ চলছে বহুবিধ শাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের। সেই উদার পরিমন্ডল আত্মস্থ করতে পারলেন না সংকীর্ণমনা যুবক। মনোঃক্ষুন্ন হয়ে আগ্রা ত্যাগ করে অচিরেই ফিরে এলেন শিরহিন্দে।

১৫৯৯-১৬০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তীর্থযাত্রার মানসে দিল্লী উপস্থিত হলেন মুজাদ্দিদ। সেখানে এক বন্ধুর মারফৎ পরিচিত হলেন বাকি বিল্লার সঙ্গে। বাকি বিল্লা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন দ্বীন প্রাণ যুবককে। মুজাদ্দিদও বাকি বিল্লার চুম্বকীয় ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর মুরিদ হয়ে গেলেন। গড়ে উঠলো মুরিদ-মুর্শেদ একাত্মতা। দুজনেই সমান মৌলবাদী! বিদায় নেবার সময় মুরিদকে উপদেশ দিলেন মুর্শেদ, সুফীদের মত কথা বলবে না, কথা বলবে আলিম বা জ্ঞানীদের মত।

শিরহিন্দে কিছুকাল অবস্থানের পর মুর্শেদগিরি করার জন্য লাহোরে চলে গেলেন মুজাদ্দিদ। সেখানে বহুলোক মুরিদ হলো তাঁর। কিন্তু ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে বাকি বিল্লার মৃত্যুর পর দিল্লী ফিরে এলেন মুজাদ্দিদ। তবে মুর্শেদের মত নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন না করে সরাসরি রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। রাজসভার আমীর ওমরাহ ও বিদ্বৎজনের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন তাঁর মৌলবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শ। অক্ষরে অক্ষরে শরিয়ৎ মেনে চলার সুপারিশ। আকবরের আমলে যে সমস্ত সংস্কার ভারতীয় জনগণকে এক সূত্রে গেঁথে এক বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেছিল, মুজাদ্দিদ সেগুলিকেই বললেন ইসলামের বিশুদ্ধতা নাশকারী এবং মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। এইসব 'ক্ষতিকর' ও 'বিশুদ্ধতা নাশকারী' প্রথা দূরীভূত করার জন্যই নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন তিনি। এই সময়েই তিনি নিজেকে ঘোষণা করলেন 'মুজাদ্দিদ অ্যালফ স্যানী' বলে। মূলতঃ আকবরের আমলে আগ্রার বিদ্বৎসভার উদার মানসিকতাই মুজাদ্দিদের প্রতিক্রিয়াশীল ও হিন্দুঘাতী মানসিকতার বিস্তার ঘটায়। কিন্তু এর উৎস নিহিত ছিল তাঁর শিশুকালে দেখা থানেশ্বর, কুরুক্ষেত্র, কাংড়া প্রভৃতি হিন্দু তীর্থস্থানে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের স্বচ্ছন্দ চলাফেরা। আকবরের আমলে হিন্দুরা এইসব ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো। আকবর উচ্চারিত সবার সঙ্গে শান্তির বাণীকে তিনি ঘৃণার চোখেই দেখতেন। দেখে ব্যথিত হতেন যে সুন্নী মুসলমানরা শিয়া, হিন্দু, খৃষ্টান, পারসী, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি মতাবলম্বীদের ওপর সন্ত্রাসের ডান্ডা ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে না। উপরন্তু এই সব 'অসত্য' মতাবলম্বীরা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী রাজকার্যে নিযুক্ত হচ্ছেন!

আকবরের রাজত্বের শেষদিকে যুবরাজ সেলিমের বিদ্রোহ রাজসভার একাত্মতা কিছুটা ক্ষুণ্ন করে এবং মৌলবাদীদের কিছুটা সুযোগ এনে দেয়। মৌলবাদীরা সেলিমকে তাদের পছন্দের ঘোড়া বলে স্থির করে এবং সেলিমের মাধ্যমেই দেখতে থাকে দার-উল-ইসলামের স্বপ্ন। আকবরের শেষ সময়ে উত্তরাধিকার জনিত বিবাদে তারা সেলিমের পক্ষই অবলম্বন করে। ইসলামী মৌলবাদীরা দাবী করে যে মূলতঃ মুজাদ্দিদের সমর্থনেই সিংহাসন দখল করেন সেলিম। কিন্তু ঐতিহাসিক রিজভী তথ্যাবলী সহযোগে প্রমাণ করেছেন যে সেলিমের সিংহাসন আরোহণে মৌলবাদীদের ভূমিকা ছিল নিতান্তই গৌণ। দুপক্ষেই দুজন হিন্দু ওমরাহ গ্রহণ করেছিলেন অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।[২.৫]

সিংহাসনে আরোহণ করে জাহাঙ্গীর পিতার অনুসৃত নীতিই বজায় রেখেছিলেন রাজধর্মরূপে। মৌলবাদীদের তিনি রেখেছিলেন সিংহাসন থেকে বহুদূরে। নিজে সুন্নী মতবাদে বিশ্বাসী হলেও অন্যধর্মের সঙ্গে বিবাদকে তিনি তাত্ত্বিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন বলপূর্ব্বক ইসলামায়নকে। গো-কোরবাণী তো নিষিদ্ধ ছিলই উপরন্তু প্রাণীহত্যা বন্ধ করে দিয়েছিলেন সপ্তাহের দু দিন—রবিবার ও বৃহস্পতিবার।[২.৬]

মৌলবাদ প্রচার করতে গিয়ে মুজাদ্দিদ অল আরাবীর সুফী তত্ত্বকে ইসলামের মধ্যে হিন্দুধর্মের অনুপ্রবেশের সিংহদুয়ার বলে বর্ণনা করলেন। অল আরাবীর তত্ত্বকে ধিকৃত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন গজলীর শরিয়ৎ ভিত্তিক সুফী মতবাদ। বললেন, জগৎ আল্লাহর প্রতিফলন, কিন্তু একই সঙ্গে আল্লাহ থেকে দূরবর্তীও। অর্থাৎ তিনি সুফী অদ্বৈতবাদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন শরিয়তী দ্বৈতবাদকে। বললেন অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা আল্লাহকে অনুভব করার জন্য প্রয়োজন বটে, তবে ব্যবহারিক জীবনে শরিয়তই চরম নিদান। মারিফতী ইসলামের এহেন ব্যাখ্যা সুফীবাদকে হিন্দুদের থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিতে প্রবৃত্ত হলো।

এইভাবে সমন্বয়ধর্মী অল আরাবীর তত্ত্ব নির্মূল করে এক গোঁড়া শরিয়ৎ ভিত্তিক সুফীবাদের প্রবর্তন করে মুজাদ্দিদ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন—যে অগ্নি সাড়ে তিনশো বছর ধরে ধূমায়িত হতে হতে এক সময়ে প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হয়ে বিচ্ছিন্ন করলো উপমহাদেশের মৈত্রীসূত্র। সৃষ্টি করলো পাকিস্তান।

মুজাদ্দিদের হিন্দুবিদ্বেষের ঐতিহাসিক প্রমাণাবলী নিহিত আছে তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রেঃ যেগুলি তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোককে লিখেছিলেন। এইসব চিঠিপত্রের সংকলন 'মক্তুবৎ-ই-ইমাম রববাণী' নামে পরিচিত। স্যায়িখ ফরিদকে তিনি লিখেছিলেন:

ওরা যদি একবার সুযোগ পায় তবে আমাদের সবাইকে ইসলাম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে। বা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে বা আমাদের সবাইকে বাধ্য করবে বিধর্মী হতে। বিধর্ম আর ইসলাম একে অন্যের বিরোধী। একের স্থিতির জন্য অপরের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। দুটি পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের সহবাস অসম্ভব ব্যাপার। একের সম্মান অপরের অসম্মান বলে পরিগণিত হতে বাধ্য।[২.৭]

আর একটি চিঠিতে তিনি স্যায়িখ ফরিদ বুখারীকে লিখলেন, ইসলামের সমস্ত সম্মান নিহিত আছে বিধর্ম আর বিধর্মীদের অপমানের মধ্যে। যে বিধর্মীদের সম্মান করে সে মুসলমানদের অপমান করে। তাদের সম্মান করা মানে তাদের সঙ্গী করা ও তাদের মূল্য দেয়া। তাদের কুকুরের মত দূরে রাখাই কর্তব্য।[২.৮]

গোহত্যাকে তিনি সর্বদা উৎসাহ দিতেন। কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন, গোহত্যাকে হিন্দুরা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে মনে করে। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে গোহত্যা নিষিদ্ধ ছিল। পাটনার লালা বেগকে তিনি লেখেন: ভারতে ইসলামের সবচেয়ে মহান প্রথা হলো গো-কোরবানী করা। কারণ কাফেররা সারাজীবন ধরে জিজিয়া কর নিতে রাজী হবে কিন্তু গোহত্যা করতে দিতে রাজী হবে না।[২.৯]

এছাড়া তিনি জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: জিজিয়া কর ধার্যের আসল উদ্দেশ্য তাদের দলিত করা। জিজিয়ার চাপে তারা

যেন ভাল পোষাক পরিচ্ছদ কিনতে না পারে। ঐশ্বর্যের মধ্যে যেন তারা বাস করতে না পারে। তাদের সর্বদা ভয়কম্পিত রাখতে হবে। ইসলামের শক্তি ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য সর্বদা একটা অবমাননাকর অবস্থার মধ্যে রাখতে হবে তাদের।[২.১০]

হিন্দুরা সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান শাসকের প্রজা হয়ে আছে—এই সত্য মুজাদ্দিদকে কখনও সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি চাইতেন অমুসলমানদের সামগ্রিক বিনাশ। কোনও ক্রমে যদি জাহাঙ্গীরকে প্রভাবিত করতে পারতেন, তবে নিঃসন্দেহে প্রস্তাব দিতেন, অমুসলমানদের দুটি পথের একটিকে গ্রহণ করতে হবে—ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যু। কেবল মাত্র তরবারির দ্বারাই শরিয়ৎ পালিত হতে পারে—এই ছিল তাঁর স্লোগান।[২.১১]

কোন কারণে একজন হিন্দু খুন হলো সে নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। হিন্দু খুন হয়েছে শুনলেই তিনি আনন্দ পেতেন। শিখ গুরু অর্জুন দেবের হত্যার পরে তিনি তৎকালীন পাঞ্জাবের শাসক স্যায়িখ ফরিদকে লিখেছিলেন: গোবিন্দওয়ালের অভিশপ্ত কাফেরের হত্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি এবং অভিশপ্ত হিন্দুদের বিরাট পরাজয়—যদিও তিনি জানতেন কোনও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অর্জুনদেবের হত্যা ঘটেনি। অর্জুনদেবকে হত্যা করা হয়েছিল খুসরুকে সাহায্য করার অপরাধে।[২.১২]

সুখের বিষয় সেই তুর্কী আমলেও মুজাদ্দিদ ছিলেন নিতান্তই নিঃসঙ্গ। সে আমলে নিষ্ঠাবান মুসলমানের অভাব ছিলনা। কিন্তু তাঁরা কেউই অমানুষ ছিলেন না। শুধু মাত্র মুসলমান নয়, এই অপরাধে নরহত্যা ও অত্যাচার করতে কেউই রাজী হতে চাইতেন না। মুজাদ্দিদের আবেদন নিবেদন সীমাবদ্ধ ছিল আমীর ও ওমরাহদের প্রতি। সাধারণ মানুষ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না।

কিন্তু সম্রাট মুহী-অল-দ্বীন আওরঙ্গজেবের (১৬৬৮-১৭০৭) আমলে মুজাদ্দিদের স্বপ্ন অনেকটাই রাজধর্মে রূপায়িত হয়। মুজাদ্দিদের তত্ত্বে বিশ্বাসী আওরঙ্গজেব শরিয়ৎ অনুযায়ী দেশশাসন করতে থাকেন। তিনি সমাজজীবন থেকে যাবতীয় অপকর্ম ও ব্যভিচার দূর করে কোরাণ হাদিশ নির্দেশিত সমাজব্যবস্থার পত্তনে কৃতসঙ্কল্প হন। তারই পদক্ষেপ হিসাবে গোটা দেশ থেকে নির্বাসিত করতে সচেষ্ট হন মদ্যপান, ব্যভিচার, গঞ্জিকা-সেবন প্রভৃতি অসামাজিক ক্রিয়াকর্মকে। সির্ক বা অংশবাদী বিচ্যুতি দূর করার জন্য তিনি ঘোষণা করেন, কবরের ওপর যে কোনও ধরণের নির্মাণ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ বিভিন্ন সুফী সন্তের মাজারে তীর্থযাত্রাও। গরীব মুসলমানদের সাহায্যার্থে তিনি বিনামূল্যে লঙ্গরখানা ও সরাইখানা চালু করেন। পুনঃ প্রবর্তন করেন আকবরের আমল থেকে রহিত জিজিয়া করের।

আওরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বকালে প্রশাসনের নতুন একটি বিভাগ চালু করেন—ইহতিসাব বিভাগ। এই বিভাগের কাজ ছিল ইসলামী মৌলভী ও দ্বীনবেত্তাদের আর্থিক সাহায্যদান, জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের ওপর লক্ষ্য রাখা এবং দমন-পীড়ন ইত্যাদি নানা উপায় দ্বীনের উন্নতি সাধন। প্রথম প্রথম ইসলামী নৈতিকতা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বিভাগটিকে ব্যবহার করা হলেও পরে এটি হিন্দু দলনের কাজেই ব্যবহৃত হয়। মূর্তি প্রজার বিরোধিতা এবং ৮/১০ বছরের পুরনো মন্দির ধ্বংসই এই বিভাগটির কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সামরিক অভিযানের সময় মন্দির ধ্বংসের নীতিকে আওরঙ্গজেব পুনঃরুজ্জীবিত করেন। এই নীতি অনুসারে পালামৌ, কুচবিহার, রাজস্থান এবং পরে দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি নির্দয়ভাবে

ধ্বংস করা হয়।[২.১৩] বারানসী ছিল যুবরাজ দারাশুকোর জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রভূমি। সুফীবাদের বিখ্যাত পন্ডিত মুহাম্মদী বারানসীর ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের সভাসমিতিতে নিয়মিত উপস্থিত থেকে বেদান্ত ও উপনিষদের নিগূঢ় বিষয়সমূহের জ্ঞানলাভ করতেন। সুতরাং বারানসীই আওরঙ্গজেবের হিন্দুদলনের সবচেয়ে অনুকূল স্থান বলে বিবেচিত হয়েছিল। রাজত্বের দ্বিতীয় বছর আওরঙ্গজেব বারানসীর মন্দির আক্রমণ করে ধ্বংস করেন এবং পাশেই জ্ঞানব্যাপী মসজিদ নামে খ্যাত মসজিদটি নির্মাণ করেন। বারানসীতে আরও কিছু মন্দির ধ্বংস করা হয়। মুসলমান অফিসার ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির মুসলমানরা শহরের ব্রাহ্মণদের নিগৃহিত করে। ফরমান জারী করা হয়, পুরানো মন্দির সংস্কার করা যাবে না এবং নতুন মন্দির, যেগুলি ৮/১০ বছরের মধ্যে নির্মিত হয়েছে সেগুলি ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

সোমনাথের মন্দির সহ অনেক মন্দির আওরঙ্গজেব গুজরাট প্রদেশের গভর্ণর থাকাকালীনই ধ্বংস করেছিলেন। পরে সেগুলি বহুকষ্টে নানা সময়ে পুনর্নির্মিত হয়। নতুন ফরমানে তিনি আবার এগুলি ধ্বংসের নির্দেশ দিলেন। মথুরায় কেশব রায়ের মন্দিরের চারিদিকে যুবরাজ দারাশুকো পাথরের প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। আওরঙ্গজেব নির্দেশ দিলেন, সেই মন্দির ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এছাড়া বারানসী, মুলতান, থানেশ্বর প্রভৃতি স্থানে বহু হিন্দু বিদ্যাপীঠ ছিল। সেগুলিতে জ্ঞানলাভ করতে আসতো দূর-দূরান্তের হিন্দুমুসলমান ছাত্ররা। আওরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের বারো বছরের মধ্যে সেগুলিকে ধ্বংস করে ফেললেন।[২.১৪] তাঁর আমলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও হিন্দুদের ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। মুসলমান ব্যবসায়ীদের ওপর থেকে কর প্রত্যাহার করে নিয়ে হিন্দু ব্যবসায়ীদের উপর বিক্রয়কর আরোপ করা হয় ৫% হারে।

আওরঙ্গজেবের বিধান সমূহ ভারতীয় মুসলমান সমাজ থেকে সমন্বয়বাদ এবং বহুশতাব্দী সঞ্চিত কুসংস্কার বিতাড়নে কিছুটা সাহায্য করেছিল। সাহায্য করেছিল কাফেরদের উপর ইসলামের ক্ষমতা বলবৎ করতে। কিন্তু বিনষ্ট করেছিল মোগল সাম্রাজ্যের সুনাম ও শুভেচ্ছা—যা সম্রাট আকবরের সময় থেকে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ওপর বর্ষিত হয়েছিল করুণাধারার মত। এবং হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ। সুতরাং অচিরেই মারাঠা, জাঠ, রাজস্থানী, শিখ প্রভৃতি হিন্দুশক্তিরা বিদ্রোহ সুরু করলেন। এইসব বিদ্রোহ ও বৈষম্যজনিত অন্য নানাবিধ কারণ সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তুললো। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দেখা গেল উপমহাদেশের মুসলমানরা এক ভঙ্গুর সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে।

মোগল সাম্রাজ্যের এই ভাঙ্গনের যুগে উদ্ভাস ঘটলো শাহ্ ওয়ালিউল্লার (১৭০৩-৬৪)। মক্কা ও মদিনায় সুশিক্ষিত এই মৌলবাদী মুজাদ্দিদের মতই নকশবন্দীয়া সুফী। তিনি বললেন, আওরঙ্গজেব যা করতে পেরেছেন তা যথেষ্ট নয়। হিন্দু রীতিনীতি ও বিশ্বাস অনুপ্রবেশের ফলে যেহেতু ভারতীয় ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেহেতু এর সংস্কার দরকার। তিনি বললেন, ইসলামের আবেদন চিরন্তন। কিন্তু এর বিস্তৃত আচার পদ্ধতি চিরকালীন নয়। সুতরাং অবিরত ইজতেহাদ বা সৃষ্টিশীল যুক্তিচিন্তার প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর ইজতেহাদ নিতান্তই মৌলবাদে পরিণত হলো যখন তিনি বললেন, চার সুন্নি ফিক—হানাফী, সফীই, মালিকী এবং হানবলীর বদলে কোরাণ ও হাদিশই প্রযুক্ত হবে। এ আসলে নতুন মলাটে উগ্র

হানবলী মতবাদ। এই উদ্দেশ্যে তিনি কোরাণের ফার্সী অনুবাদ করলেন। কারণ দেশের সাধারণ মুসলমানরা আরবী থেকে ফার্সীই ভাল বুঝতেন। আর শাহ্ ওয়ালীউল্লার চিন্তাধারা যে ভারতে প্রচলিত হানাফী ফিকের থেকে উগ্র তা একটি মাত্র উদাহরণ থেকেই উপলব্ধ হবে: হানাফী মতে নরহত্যার মত অপরাধের শাস্তি মোমিন-কাফের উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান। শাহ্ বললেন, তা কেন হবে, মোমিনরা কাফেরদের থেকে কম দন্ডভোগ করবে।

শাহ্ বললেন, ইসলামী উম্মা ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। সুতরাং নতুন নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য অবিরত ইজতেহাদের প্রয়োজন। তিনিই সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রথম মুসলমান চিন্তাবিদ, যিনি বললেন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য ইসলামকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

কিন্তু প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সম্রাট আকবর যে পথে বিচরণ করেছিলেন, সে পথের পরিবর্তে ইসলামের এই অদ্বিতীয় পন্ডিত সপ্তম শতাব্দীর আরবের পথেই পা বাড়ালেন। কাফের দমন করে ভারতকে তিনি পরিণত করতে চাইলেন দার-উল-ইসলামে। এই উদ্দেশ্যে তিনি লুটেরা নাদির শাহের সেনাপতি আহমদ শাহ দুররাণীকে ডেকে পাঠালেন ভারতে। কিন্তু দুররাণী ভারতে কোনও ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হলেন না। তিনি বার বার অনুপ্রবেশ করে করে উত্তর ভারত লুট করে যেতেন মাত্র।

এক চিঠিতে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দুররাণীকে লিখেছিলেন: তিনিই হচ্ছেন একমাত্র রাজা, যার যথেষ্ট জনবল আছে, আছে সাহসিকতা ও পৌত্তলিকদের ধ্বংস করার মত প্রচুর দূরদর্শিতা। সুতরাং এটা হচ্ছে তাঁর পবিত্র দায়িত্ব—জেহাদ ঘোষণা করা এবং দাস হিসাবে ক্রীত মুসলমানদের মুক্ত করা। আর যদি তা না করা হয় তবে মুসলমানরা তাদের দ্বীনকে ভুলে যাবে, তারা হবে আধা মুসলমান, আধা পৌত্তলিক।

একটি আবেদনের মাধ্যমে এটি শেষ করা হয়েছে: আমরা আপনার কাছে অনুরোধ করছি যে রসুলের নামে এই অঞ্চলের কাফেরদের বিরুদ্ধে আপনি জেহাদ ঘোষণা করুন। এর জন্য আল্লাহ আপনাকে মহাপুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন এবং আপনার নাম শহীদদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।[২.১৫]

কিন্তু লুটেরা দুরবাণী মোটেই দিল্লীশ্বর হতে চাইলেন না। জেহাদ করা দূরের কথা।

সাময়িক ভাবে হতাশ হলেও শাহ্ কখনও আশা ছাড়তেন না। মুজাদ্দিদের মতই লাগাতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন কাফের দমনের। দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে তিনি দিল্লীর লম্পট মোগল সম্রাটকে লিখলেন: সম্রাটকে ইসলামী শহরে এই মর্মে ফর্মান জারী করতে হবে যে কাফেররা হোলি খেলা, ধর্মীয় স্নান ইত্যাদি যেসব ধর্মীয় উৎসব পালন করে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।[২.১৬]

নিজাম-উল-মূলককে এক চিঠিতে শাহ্ লিখেছিলেন: আমার মনে হয় আল্লাহর দ্বারা এটা পূর্বনির্ধারিত যে কাফেরদের অপমানজনকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হবে এবং চরম ঘৃণ্য ব্যবহার করা হবে তাদের সঙ্গে।[২.১৭]

শাহ্ তাঁর 'হুজ্জত-আল্লা-অল-বালিঘা'তে লিখেছেন: শিশুকে যেমন করে তেতো ওষুধ খাওয়ায় ঠিক তেমন করে মানুষের গলার মধ্যে শরিয়ৎ ঢুকিয়ে দিতে হবে। এবং এটা তখনই সম্ভব হবে যখন অমুসলমানদের নেতাদের হত্যা করা হবে। শক্তি ক্ষয় করা হবে

তাদের। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হবে যে ওই সব অমুসলমান নেতাদের অনুগামী এবং বংশধররা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে।

তিনি আরও লিখেছেন, ইসলামায়নের এক উপায় হলো অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিজ নিজ ধর্মীয় উপাসনা থেকে বিরত রাখা। এছাড়া প্রতিশোধ গ্রহণের আইনের বেলায়, নরহত্যা এবং বিবাহের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অমুসলমানদের ওপর বৈষম্যমূলক আইনগুলো চাপিয়ে দেওয়া।

কিন্তু শাহ্ ওয়ালিউল্লার ইসলামায়নের কর্মসূচী শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর মতে নিম্নশ্রেণীর কাফেরদের শুধুমাত্র ক্ষেত খামারের কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে এবং জিজিয়া কর আদায় করতে হবে তাদের কাছ থেকে। ভারবাহী পশু বা কৃষি কাজের বলদের মত দুরবস্থা ও হতাশার মধ্যে থাকবে তারা।[২.১৮]

শাহ্ ওয়ালিউল্লার মৃত্যুর প্রাক্কালে পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যেও দেশ ছিল তত্ত্বগতভাবে দার-উল-ইসলাম। সুতরাং দেশের পুরো ইসলামায়নই ছিল মৌলবাদীদের চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অনুযায়ী বালুচ, আফগান ও অন্যান্য মুসলমান জমিদাররা এবং বিভিন্ন সাময়িক শাসকেরা নিজ নিজ এলাকার হিন্দুদের ইসলামায়িত করেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লার পুত্র আবদুল আজিজও হেদায়েতীকরণ করেন বহু হিন্দুকে। কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দেশ দার-উল-হরব ঘোষিত হয়ে যাওয়ার পর শাহ্ ওয়ালিউল্লার আরব্ধ কর্মে যে মৌলবাদী নতুন মাত্রা সংযোজিত করেন এবং বৃটিশ দার-উল-হরবে জেহাদের আহ্বান জানিয়ে গ্রহণ করেন উপমহাদেশ পুনঃইসলামীকরণের ব্রত, তিনি স্যায়িদ আহমদ বেরিলবী (১৭৮৬-১৮৩১)। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বিশ্বজুড়ে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করার তত্ত্বে পরম বিশ্বাসী ছিলেন রায়বেরিলীর এই সন্তান। তাঁর গোটা জীবনটাই জেহাদ। উপমহাদেশে দার-উল-ইসলাম পুনঃ. প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই মর্মান্তিকভাবে শহীদ হন তিনি।

বেরিলীর অভিনবত্ব হচ্ছে ইসলামী মৌলবাদকে তিনি দিল্লীর সম্রাট ও টঙ্কের নবাব থেকে শুরু করে সাধারণ নিরক্ষর কৃষক পর্যন্ত বিস্তৃত এক সমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট করতে সমর্থ হন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জেহাদে টেনে আনেন উপমহাদেশের প্রায় সমস্ত মুসলমানকে। সেজন্যে ভারতের ইতিহাসে তাঁর স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ।

স্যায়িদ আহমদের জন্ম রায় বেরিলীর এক দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে। দ্বীনের সম্মান রক্ষায় শিশুকাল থেকেই তিনি ছিলেন খড়গহস্ত। বালক বয়সেই ইসলামের অপমান দেখলেই তিনি হাতাহাতি শুরু করে দিতেন। তাঁর জননী এ বিষয়ে পূর্ণ প্রশ্রয় দিতেন তাঁকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের বকাবকি সত্ত্বেও বাল্যকালে যথাযথ শিক্ষা অর্জনে তেমন আগ্রহ দেখাননি বেরিলবী। তবে কিছু কিছু ফার্সী ও আরবী শিখেছিলেন। মনপ্রাণ ছিল খেলার দিকেই। শিশু কাল থেকেই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতে ভালবাসতেন। যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন বিভিন্ন রকমের শারীরিক বিদ্যায়।

যৌবনের প্রারম্ভে বেরিলবী কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে লক্ষৌ শহরে উপনীত হলেন চাকুরীর সন্ধানে। কিন্তু সেখানে প্রত্যাশিত কিছু না ঘটায় চলে এলেন দিল্লীতে। দিল্লীতে ওই সময়

শাহ্ ওয়ালিউল্লা প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা রহমনিয়াতে সগৌরবে অধ্যাপনা করছিলেন তাঁর পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজ। বেরিলবী উপস্থিত হলেন তাঁরই কাছে। শাহ্ আবদুল আজিজ যুবকের দ্বীনানুরাগ দেখে তাঁকে স্বমতে দীক্ষা দিলেন। তাঁরই আশ্রয়ে থেকে জ্ঞানচর্চা করতে লাগলেন যুবক বেরিলবী।

বছর দুয়েক জ্ঞানচর্চার পর দেশে ফিরে এলেন বেরিলবী। বিবাহ করলেন, পিতাও হলেন এক কন্যার। সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করতে লাগলেন ইসলাম। দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে বেরিলবী দেখলেন, হিন্দুধর্ম থেকে ইসলামায়িত মুসলমানদের মধ্যে নানা হিন্দুজনিত কুসংস্কার বর্তমান। তাছাড়া এতো বছর ধরে সুলতানী শাসনের পরেও দেশের তিন চতুর্থাংশ মানুষ হিন্দু! সুতরাং বেরিলবী ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শরিয়ৎ বিস্তার ও জেহাদের মাধ্যমে ভারতে দার-উল-ইসলামের প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করলেন। ব্রত উদযাপনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ফিরে এসে নাম লেখালেন টঙ্কের নবাব আমীর খাঁর লুটেরা সৈন্যদলে। আমীর খাঁ ভারতের ইতিহাসে পিণ্ডারী দস্যুসর্দার হিসাবেই পরিচিত। তিনি ইংরেজদের সাহায্যে দস্যু সর্দারের খেতাব থেকে উপরে উঠে টঙ্কের নবাব হয়েছিলেন মাত্র। যাই হোক, সৈন্যদলে যুদ্ধ করার চেয়ে দ্বীনচর্চার দিকেই বেশী উৎসাহ ছিল বেরিলবীর। সেইজন্য সৈন্যদলে তিনি দ্বীন বিষয়ক 'পেশ ইমাম' পদ পান। এই পদের দৌলতে তিনি সুযোগ পেয়ে যান আমীর খাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসার। এছাড়া নানা যুদ্ধে যোগদানের ফলে যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন, যা তাঁর পরবর্তী জীবনে কাজ দেয়। বেরিলবীর ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে আমীর খাঁর সৈন্যদলে যোগদানের উদ্দেশ্য ছিল আমীর খাঁকে জেহাদে প্ররোচিত করে ভারতে দার-উল-ইসলামের পত্তন। কিন্তু আমীর খাঁ ছিলেন বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদী মাত্র। নিজের স্বার্থে তিনি পরবর্তীকালে ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলান। নিজেকে টঙ্কের নবাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার পরই বিরাট সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় তাঁর। কাজে কাজেই সৈন্যদল ভেঙ্গে দেন তিনি। ভেঙ্গে যাওয়া সৈন্যদলের পেশ ইমামও দিল্লীতে ফিরে আসেন। আকবরাবাদী মসজিদে অবস্থান করে শরিয়তী ইসলাম প্রচার করতে থাকেন মানুষের মধ্যে। বা'আত দিতে থাকেন বিভিন্ন মানুষকে।

বা'আত হলো সুফী মতবাদে দীক্ষা। বেরিলীর সুফী মতের নাম ছিল সুলুক-ই-রহ-ই-নুবুওয়াত বা নবীব আচরিত মরমীবাদ। এই মতে মরমীয়া হতে গেলে শরিয়ৎ মেনে বিশুদ্ধ হতে হবে। এই মতের দ্বারা বিভিন্ন সুফী তরিকাকে শরিয়তের কোলে টেনে আনাতেই ছিল বেরিলবীর বিশেষত্ব। তাঁর বা'আত ছিল বা'আত-ই-ইমামত—জেহাদের জন্য একজন ইমামকে মেনে চলা। তিনি যে মতবাদ প্রচার করলেন বস্তুতঃ তারই নাম 'তরিকা-ই-মহম্মদীয়া'।[২.১৯]

এই সময় আবদুল আজিজের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ্ মহম্মদ ইসমাইল এবং জামাতা আবদুল হাই বেরিলবীর কাছে বা'আত গ্রহণ করেন। শাহ ইসমাইলই উদার হানাফী সুন্নী মতবাদ ত্যাগ করে 'তরিকা-ই-মহম্মদীয়া' মতের তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেন। আবদুল হাই অবশ্য শেষ পর্যন্ত হানাফী মতবাদেই বিশ্বাসী ছিলেন। যদিও তিনি এবং শাহ্ ইসমাইল উভয়েই বেরিলবীর সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শহীদ হন।

এই দিল্লীতে থাকাকালীনই বেরিলবী জেহাদের মাধ্যমে উপমহাদেশে দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তাঁর এ স্বপ্নে পূর্ণ সহযোগী হন শাহ্ ইসমাইল ও আবদুল হাই। কিন্তু বেরিলবী জেহাদের মুজাহিদ সংগ্রহের জন্য কোনও নবাব-বাদশাহের দ্বারস্থ হলেন না; নিজেই ব্যাপক জনসংযোগের দ্বারা জেহাদের মানসিকতা গড়ে তুললেন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে।

বেরিলবী সর্বদা অস্ত্রশস্ত্র সহ ভ্রমণ করতেন। সেই দেখে এক ভদ্রলোক বললেন, মশাই, আপনার সবকিছুই আমার পছন্দ হয়, কেবল একটি ব্যাপার ছাড়া—যেটি আপনার পূর্বপুরুষেরা কদাচ করতেন না।

— কী সেই ব্যাপার? শুধালেন বেরিলবী।

—আপনি সর্বদা অস্ত্র বহন করেন। ও সব তো অশিক্ষিত লোকেদের কাজ!

বেরিলবী ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন আপনাকে কী আর বলবো! আল্লাহ্ পয়গম্বরদের এইসব অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছিলেন কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য। আমাদের পয়গম্বর কি অস্ত্রধারণ করে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্যের আলো বিকিরণ করেন নি? তিনি যদি অস্ত্র ধারণ না করতেন, তবে কি আজ আমরা মোমিন থাকতাম?[২.২০]

দিল্লীতে কিছুকাল অবস্থানের পর বেরিলবী গঙ্গা ও যমুনা বিধৌত উত্তর প্রদেশের সমতলভূমিতে তরিকা-ই-মহম্মদীয়া প্রচারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। ভ্রমণ করলেন সাহারাণপুর, রামপুর, সাজাহানপুর, ফুলুত, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি শহর। সংগ্রহ করলেন প্রচুর মুরিদ। তাঁর মতবাদের এক দিকে জেহাদ অন্যদিকে সির্ক বা অংশবাদের বিরোধিতা। ইসলামে বলা হয়েছে আল্লাই একমাত্র ঈশ্বর। অন্য কিছুর উপর সামান্যতম ঈশ্বরত্ব আরোপ করা পাপ। এই পাপ সির্ক নামে অভিহিত। তরিকা-ই-মহম্মদীয়ার মূলতত্ত্ব হলো:

(১) আল্লাহর বিভূতি যেন মানুষে আরোপিত না হয়। কারণ, পরী, প্রেত, ভূত, পুরোহিত, গুরু, জ্যোতিষী, পীর-ফকির কারুরই ভাল করবার শক্তি নেই। সুতরাং এদের দেবত্ব মানা পাপ।

(২) কোনও রূপ বাহ্যানুষ্ঠান করা উচিত নয়। বিবাহ্ বা শ্রাদ্ধে কোনও রকম উৎসব করা বারণ। সমাধি সজ্জিত করা, সমাধির ওপর স্থাপত্য নির্মাণ করা, মহরমের তাজিয়া তৈরী করা বা মৃতের বাৎসরিক উৎসব করা—এই সবই নিষিদ্ধ।

এই তত্ত্ব প্রসারের উদ্দেশ্য নব্য মুসলমানদের মধ্যে শরিয়তের প্রতিষ্ঠা। ভারতের জনগণ ছলে বলে কৌশলে যুগে যুগে ইসলামায়িত হচ্ছিল। কলেমা পড়ে মুসলমান হলেও তারা পূর্বপুরুষদের সংস্কার সহজে ভুলতে পারেনি। অনেক দেশজ আচার অনুষ্ঠানই তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল এবং আজও আছে। সেইসব মানবিক সংস্কারের বিরোধিতা করে পূর্ণ ইসলামায়নই মৌলবাদীদের চিরকালীন উদ্দেশ্য।

সফরের শেষে বেরিলবী দিল্লী ফিরে এলেন এবং সেখান থেকে তাঁর দেশ রায়বেরিলীতে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষে হজ যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত রায়বেরিলীতেই তাঁর বাসস্থান করলেন। তবে মাঝে মাঝেই তিনি পর্যটনে বেরিয়ে পড়তেন দেশে দেশে। অজস্র লোককে বা'আত দিতেন। অনুপ্রাণিত করতেন জেহাদে।

এইরকম এক ভ্রমণে তিনি উপনীত হলেন লক্ষ্ণৌএ। সেখানে তাঁর বা'আত গ্রহণ করলেন বেলায়েত আলী ও অযোধ্যার নবাব নজিব-উদ-দৌল্লা। বেরিলবীর শহীদত্বের পরে এই

বেলায়েত আলীই জেহাদ ও তরিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলনের কর্ণধার হন। ভ্রমণ করতে করতে জেহাদের সৈনিক সংগ্রহের পাশাপাশি বেরিলবী তাদের যুদ্ধ কৌশল শেখারও বন্দোবস্ত করতেন। লক্ষ্ণৌএ একদা তিনি এক স্বাস্থ্যবান যুবককে একটি কারবাইন দিয়ে বললেন, জেহাদ করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হও, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে শেখো। সাধু সন্তের জীবনযাপন করার চেয়ে জেহাদ করা অনেক পূণ্যের কাজ।[২.২১]

বেরিলবী আর একটি সংস্কার করেছিলেন—মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহের পুনঃপ্রচলন। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলমানরা বিধবা বিবাহকে সুনজরে দেখতেন না। হিন্দুদের মত তাঁরাও ভাবতেন, বিধবার বিবাহ মৃত স্বামীর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ। উচ্চশ্রেণীর মুসলমান পরিবারের বধূরা স্বামীর মৃত্যুর পরে অবিবাহিতই থেকে যেতেন। কিন্তু ইসলামী মতে বিধবা বিবাহ একটি সুন্না বা নবীর আচরিত কর্ম। সুতরাং পালনীয় প্রথা। বেরিলবী আদর্শ স্থাপনের মাধ্যমে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে জঙ্গ ঘোষণা করলেন। তবে তিনি পরিবারের বাইরের কোনও বিধবার পাণিপ্রার্থী হলেন না। স্নেহময় অগ্রজ মহম্মদ ঈশাকের বিধবা পত্নীরই পাণি পীড়ন করতে মনস্থ করলেন। ভদ্রমহিলা দেবরের এ হেন অভিনব প্রস্তাবে প্রথমে নারাজ হলেন। বেরিলবী তখন এক মাসীকে নিয়োগ করলেন বিধবার মস্তিষ্ক ধোলাইএর কাজে। ওই মাসী আবার বিধবারও মাসী। শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হলো বিধবাকে। দেবর নিজে বিয়ে করেই সন্তুষ্ট হলেন না। সবাইকে চিঠি লিখে লিখে এই বিবাহকে একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করতে বললেন।[২.২২]

রায় বেরিলীর বাড়ীতে বসেই জেহাদের পরিকল্পনা ছকতে লাগলেন বেরিলবী। তিনি ঠিক করলেন হজরৎ মহম্মদের মত হিজরৎ করে প্রথমে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে চলে যাবেন। সেখানকার উপজাতিরা ভাল যোদ্ধা এবং সবাই মুসলমান। ওই সব উপজাতিদের সাহায্যে জেহাদ করে হিন্দুস্থানে ঢুকবেন—যেমন করে নবী মদিনা থেকে মক্কায় ঢুকেছিলেন। সেইভাবেই তিনি হিন্দুস্থানকে পরিণত করবেন পাকিস্তানে। তারপর তিনি ভাবলেন, শুভকাজ করার আগে হজ করা প্রশস্ত। তাছাড়া ওই সময়ে হজ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ ভারত মহাসাগরে ও আরব সাগরে ইউরোপীয় বোম্বেটেদের আধিপত্য। ফতোয়া জারী করা হয়েছিল জীবনপণ করে হজযাত্রার প্রয়োজন নেই। বিক্ষিপ্তভাবে যে কিছু মক্কা যাত্রা হতো না এমন নয়। এ প্রসঙ্গে ফরাজী আন্দোলনের স্রষ্টা হাজী শরিয়ৎউল্লার কথা মনে আসতে পারে। শরিয়ৎ উল্লা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মক্কা যান। বৃটিশ শক্তি দেশ অধিকার করলে দেশ দার-উল-হরবে পরিণত হয়েছে বিবেচনায় অনেকে দেশত্যাগ বা হিজরৎ করেন। শরিয়ৎউল্লা তাঁদেরই একজন। হাজী মহম্মদ মহসীনের (১৭৩০-১৮১২) মক্কাযাত্রাও ওই ধরণের এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এগুলি যথার্থ হজযাত্রা নয়। বেরিলবী চতুর্দিকে খবর পাঠালেন, যাঁরা হজযাত্রা করতে চান, তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই রায়বেরিলীর বাড়ী থেকে হজ যাত্রা শুরু করলেন বেরিলবী। সঙ্গে স্ত্রীলোক ও শিশু সমেত ৪০০ জন যাত্রী। পদব্রজে ডালমৌ এসে গঙ্গার জলপথ ধরলো যাত্রীর দল। ওখানে তাঁবু ফেলে নৌকা ঠিক করতে কয়েকদিন সময় লাগলো। নৌকার সংখ্যা অপ্রতুল। তাতে সব তীর্থযাত্রী ধরলো না। ফলে কিছু লোক গঙ্গার তীর

ধরে হাঁটতে লাগলো। বিভিন্ন শহরের ঘাটে ভিড়তে ভিড়তে চললো যাত্রীর দল। প্রতিটি ঘাটেই বিপুল জন-সম্বর্ধনা। আবদুল হাই ও বেরিলবীর বক্তৃতা। প্রতিটি বক্তৃতাতেই জনগণকে শরিয়ৎ মেনে চলতে আহ্বান জানালেন বেরিলবী। তীর্থযাত্রীর দলও ক্রমশঃ স্ফীত হতে লাগলো। প্রথম বড় ধরণের যাত্রাবিরতি এলাহাবাদে। সেখানে তীর্থযাত্রীর দল আতিথ্য গ্রহণ করলো স্যায়িদ গোলাম আলীর। অজস্র লোক এলো বেরিলবীর বাণী শুনতে। বা'আত গ্রহণ করলো তারা। বারো দিন বিরতির শেষে বেরিলবী গোলাম আলী ও হাফিজ ইমাম-উদ-দ্বীনকে নিযুক্ত করলেন নবদীক্ষিতদের আধ্যাত্মিক দেখভাল করার জন্য। আবার যাত্রা শুরু হলো।

এলাহাবাদের পর বারানসী। অত্যাধিক বৃষ্টির জন্য যাত্রীরা এখানেই অবস্থান করলো মাস দুয়েক। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে বেরিলবী আশপাশের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে তরিকা-ই-মহম্মদীয়া মত প্রচার করতে লাগলেন। বারানসী থেকে পাটনা। এখানেও বেশ কয়েকদিনের বিরতি। অজস্র মানুষের সমাগম। তাদের মধ্যে বক্তৃতা। বা'আত গ্রহণ। পাটনা থেকে পাল উঁচিয়ে যাত্রীদল সুরজগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, হুগলী হয়ে নভেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতায় এসে পৌঁছলো। কলকাতার গঙ্গার ঘাটে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পদস্ত কর্মচারী মুন্সী আমিনুদ্দিন সাদর সম্ভাষণ জানালেন বেরিলীর হজ যাত্রী দলটিকে। আজ যেখানে নাখোদা মসজিদ অবস্থিত, সেখান সদ্য খরিদ করা একটি বিশাল বাংলোতে সসমাদরে বেরিলবীসহ বিশাল তীর্থযাত্রীর দলটিকে আশ্রয় দিলেন মুন্সী আমিনুদ্দিন।[২,২৩]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বাষ্পচালিত জাহাজগুলি ভিড়তে আরম্ভ করেছে কলকাতা বন্দরে। আসল হজ যাত্রার শুরু কলকাতা থেকেই। নব প্রচলিত বাষ্পীয় পোতে। কলের জাহাজ ভাড়া করা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি কাজ সারতে পুরো তিনমাস সময় লেগে গেল। এই তিন মাসে হাজার হাজার লোক দর্শন করতে এলো বেরিলবীকে। এরা শুধু কলকাতার লোক নয়। সারা বঙ্গদেশের লোক। এমনকি সুদূর শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম থেকেও লোক এলো বেরিলবীর বাণী শুনতে। বেরিলবী সকলকেই বা'আত দিলেন তরিকা-ই-মহম্মদীয়া মতে। বা'আতের পদ্ধতিতে আছে মুর্শেদের সঙ্গে মুরিদের হাত মেলানো। কিন্তু ভিড় এতোই হতে লাগলো যে হাতের বদলে মাথার পাগড়ীটাকেই খুলে দিতে হতো বেরিলবীকে। সবাই সেই পাগড়ী স্পর্শ করে শপথ নিত। এছাড়া কলকাতায় বেরিলবীর কাছে ইসলামায়িত হলো বেশ কিছু হিন্দুও।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ৭৫৩ জন হজযাত্রী সমেত দশটি বাষ্প চালিত জাহাজ মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। এই ৭৫৩ জনের মধ্যে ৬০ জন ছিল অভাবী লোক। তাদের মুফতে হজযাত্রার বন্দোবস্ত করেছিলেন বেরিলবী। হজযাত্রীরা ১৫ই মে জেড্ডা বন্দরে পৌঁছলেন। জেড্ডা থেকে রওনা হয়ে পথে হুদাইবিয়াতে যাত্রাবিরতি হলো কিছুক্ষণের জন্য। সেখানে বেরিলবী অনুগামীদের জেহাদের শপথ গ্রহণ করালেন। ২২শে মক্কায় পৌঁছলো যাত্রীরা। কিছুদিন পরে হজ করার প্রশস্ত সময় জেলহজ্জ মাস এসে গেল। প্রথামত হজ করলেন বেরিলবী : কাবা প্রদক্ষিণ করলেন, হাজারু-অল-আসওয়াদে চুমু খেলেন, মুজদিলফাতে রাত্রিবাস করে মিনাতে গেলেন প্রত্যুষের নমাজের জন্য। শয়তানের স্তম্ভ 'জামরসে' পাথর ছুঁড়ে মারলেন। ছাগল কোরবাণী করে মাথা কামিয়ে মক্কায় গিয়ে আবার প্রদক্ষিণ করলেন কাবা। তারপর ফিরে গেলেন মিনাতে। সেখানে আকাবা শহরে তার অনুগামীদের আবার শপথ গ্রহণ করালেন জেহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য।

এরপর কিছু অনুগামীদের নিয়ে অক্টোবরের শেষে মদিনা রওনা হলেন বেরিলবী। দর্শন করলেন নবীর মসজিদ ও সমাধি। একমাস সেখানে থেকে আবার প্রত্যাবর্তন করলেন মক্কায়। তারপর মক্কা থেকে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই। ফেরার পথে বোম্বাই মালাবার আলেপ্পে হয়ে কলকাতা ফিরলেন অক্টোবর মাসে। এখানে আবার ছমাসের যাত্রা বিরতি। বিরতির পর দেশে ফেরার পথে তিনি মুঙ্গের ও পাটনাতে বজরা ভিড়ালেন। মুঙ্গেরের অস্ত্র কারখানা থেকে কিনলেন প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র।[২.২৪] পাটনায় আতিথ্য গ্রহণ করলেন পূর্বদীক্ষিত বেলায়েৎ আলীর গৃহে। বেলায়েৎ আলীর পরিবারের প্রত্যেকেই দীক্ষাগ্রহণ করলেন বেরিলবীর কাছে। বেরিলবী পাটনার শাহ মহম্মদ হোসেনকে তরিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলনের খলিফা বা এজেন্ট নিয়োগ করলেন। পাটনা থেকে যাত্রা করে কয়েকস্থানে বিরতির পর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষে রায়বেরিলীতে ফিরে এলেন বেরিলবী।

দেশে ফিরে তিনি হিজরৎ ও জেহাদের যোগাড়যন্ত্র শুরু করে দিলেন। সংগ্রহ করতে লাগলেন অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ। যোগাযোগ করতে লাগলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনদের সঙ্গে। এই উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন পাঠান দলপতিদের চিঠি লিখলেন। সেখান থেকে বেশ ভালই সাড়া পাওয়া গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিভিন্ন বিবদমান পাঞ্জাবী গোষ্ঠীকে সংহত করে পাঞ্জাবে রাজত্ব করছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজা রণজিৎ সিংহ। ইংরেজ শাসন তখনও এদেশে সুদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারতের উত্তরে রুশ সাম্রাজ্য। এমত অবস্থাতে বৃটিশ রাজ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে রণজিৎ সিংহের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ওই চুক্তিতে স্থির হয় রণজিৎ সিংহ দক্ষিণ শতদ্রু অঞ্চল নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। তাঁর রাজ্যবিস্তার শুধুমাত্র উত্তর শতদ্রু অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বৃটিশের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন রণজিৎ সিংহ অমৃতসর চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার চেষ্টা করতেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ঘৃণাও করতেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। বৃটিশরাজ রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঢাল-রাজ্য হিসাবে ব্যবহার করতেন রণজিৎ সিংহের পাঞ্জাবকে।

ওই সময়ে উত্তর শতদ্রু অঞ্চলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। সেই সব রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন পাঠান দলপতিরাই। এই পাঠান দলপতিদের আনুগত্য ঘন ঘন পরিবর্তিত হতো। কখনও তারা রণজিৎ সিংহকে আনুগত্য দেখাতো। কখনও বা বিদ্রোহ করতো। ওইসব পাঠান দলপতিদের মধ্যে বরকজাই ভ্রাতারা ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময়ে রণজিৎ সিংহের নামমাত্র অধীনে পেশোয়ারে রাজত্ব করতেন ইয়ার মহম্মদ বরকজাই।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রায় বেরিলী থেকে যাত্রা করলো জেহাদীরা। কণ্ঠে তাদের জেহাদের গান: রিসালা-ই-জেহাদ:

রসূলের বাণী এই হাদীসটি শোনো—
'তরবারির ছায়ায় বেহেশত্ রয়েছে।
যে প্রশান্ত চিত্তে জেহাদে এক পয়সাও খরচ করে,
অতঃপর সে তার সাতশো গুণ বদলা পাবে।
আর যে জেহাদে দান করে এবং নিজেও শরীক হয়

আল্লাহ্ তাকে সাত হাজার গুণ বদলা দেবেন।
আল্লাহ্র রাহে যে একজন মুজাহিদকে সজ্জিত করে,
সে নিশ্চয়ই শহীদের পুরস্কার লাভ করে।
'যে জেহাদে সাহায্য করে না, কিংবা শরীক হয় না,
এ দুনিয়াতেই তার কঠিন শাস্তি অবধারিত।
জেহাদে যে নিহত হয়, সে মরণ তো মরণ নয়,
সে হাসতে হাসতে বেহেশ্তে চলে যায়।
কেন তুমি আল্লাহ্র পথে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছ না?
আল্লাহর হুকুম, শহীদের সব ছেলেই মাফ পেয়ে যাবে।
তাদের গোর-আযাব মাফ হয়ে যায়,
জে কেয়ামত বা রোজ হাশরে তাদের ভয় নেই।
আল্লাহ্ ভালবাসেন শুধু তাদের, যারা
জেহাদের ময়দানে অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
হে মোমেনগণ! জেহাদের মহিমা শুনলে, যাও যুদ্ধে যাও,
তোমার পরিবার, তোমার সম্পত্তি এসব কিছু ভেবো না।
ধন-জন-পরিবার-ঘর, সব কিছুরই বাসনা ত্যাগ করো,
যাও যুদ্ধের ময়দানে, আল্লাহ্র রাহে চলো।
মরণের পরে ধন-পরিবার নিয়ে কবরে যাবে না,
সাবধান, দোজখের শাস্তি থেকে রেহাই নেই তোমার।
যদি তোমার বরাতে থাকে, নিশ্চয়ই ঘরে ফিরবে,
আর যদি শহীদ হও, নিশ্চয়ই বেহেশ্তে চলে যাবে।
আজ দুনিয়াতে ইসলামে বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়েছে,
আর কাফেরদের ধর্ম তার স্থলে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
আগের জমানার মুসলমানরা যদি জেহাদ না চালাতেন,
তাহলে হিন্দুস্তানের বাসিন্দা কীভাবে মুসলমান হতো?
ইসলামের শক্তি সবকালেই ছিল তরবারির মুখে;
তাঁরা যদি নিষ্ক্রিয় থাকতেন, ইসলাম অজ্ঞাত বয়ে যেতো।
আর কতোকাল ঘরে নিষ্ক্রিয় বসে থাকবে, ?[২.২৫]

ডালমৌ, ফতেপুর হয়ে গোয়ালিয়রে পৌঁছলো জেহাদীরা। গোয়ালিয়রের সরলমনা মহারাজ দৌলতরাও সিন্ধিয়া বেরিলবীকে প্রাসাদে আহ্বান জানালেন। দৌলত রাও এর মন্ত্রী এবং ভগ্নিপতি হিন্দু রাও এর সঙ্গে আলোচনা হলো বেরিলবীর। বেরিলবী তঞ্চকতা করে হিন্দুরাওকে জানালেন, তিনি জেহাদ করতে চলেছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। দৌলতরাও এর কাছে যথেষ্ট সাহায্য পেলেন বেরিলবী। উপরন্তু সেই রাজ্যে নজরবন্দী আহম্মদ শাহ দুররাণীর এক পৌত্রকে মুক্ত করে দিলেন তিনি। গোয়ালিয়র থেকে টংক। সেখানে পিন্ডারী আমীর খান এবং তৎপুত্র ওয়াজির-উদ-দ্দৌলা প্রচুর সাহায্য করলেন জেহাদীদের। টংক থেকে রাজপুতানা, সিন্ধ, বালুচিস্থান পার হয়ে নভেম্বর মাসে জেহাদীরা পৌঁছলো পেশোয়ারে। সেখানে স্বল্পকাল অবস্থান করে বেরিলবী চলে গেলেন হাস্তনগর ও নৌসেরায়। জেহাদীদের আগমন এইসব

অঞ্চলের জনগণের মধ্যে প্রভূত উদ্দীপনার সৃষ্টি করলো। সুতরাং টনক নড়লো লাহোরে রণজিৎ সিংহের দরবারে। দরবার বুধ সিং সান্ধাওয়ালিয়ার নেতৃত্ব ১০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনীকে পাঠালেন জেহাদীদের মোকাবিলায়। সিন্ধু নদ অতিক্রম করে পাঞ্জাবী বাহিনী উপস্থিত হলো কাবুল নদীর তীরে।

বেরিলবী জেহাদ ঘোষণা করলেন বুধ সিংহের বিরুদ্ধে। বুধ সিংহের কাছে প্রস্তাব গেল: (১) ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে তোমরা ইসলামী উম্মার সদস্য হবে এবং আমাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

অথবা (২) জিজিয়া কর দাও, তাহলে তোমরা ধর্মত্যাগ না করেও ইসলামী দেশে জিম্মি হয়ে বাস করতে পারবে।

নতুবা (৩) যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

সঙ্গে যোগ করা হলো, মনে রাখবে গোটা পাঠান জাতি এবং সারা হিন্দুস্থানের মুসলমান সম্প্রদায় আমাদের পিছনে আছে। তোমরা ঠান্ডা সুমিষ্ট সরবৎ খেতে যত ভালবাস, মুসলমানরা জেহাদে মৃত্যুবরণ করতে তার থেকে বেশী ভালবাসে।[২.২৬]

বুধ সিং এর বিরাট সৈন্য বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য বেরিলবী রাত্রিকালীন অতর্কিত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের রাতে জেহাদীরা প্রথম আঘাত হানলো পাঞ্জাবী সৈন্যদলের ওপর। শ-পাঁচেক পাঞ্জাবী সৈন্য নিহত হলেও পাল্টা আক্রমণে জেহাদীরা পিছু হটতে বাধ্য হলো।

স্যায়িদ আহমদ বেরিলবীর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তর যাবতীয় যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছিল বর্তমান হাজারা ও পেশোয়ার জেলায় এবং সন্নিহিত স্বাত ও বানারের উপজাতি অধ্যুসিত এলাকায়। এইসব যুদ্ধগুলিকে মোটামুটিভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে (২) বিশ্বাসঘাতক উপজাতি নেতাদের বিরুদ্ধে। উপজাতি নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণ, প্রধানতঃ লুটপাটের জন্যই এইসব নেতারা জেহাদে যোগ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল। তারা কেউই দার-উল-ইসলামের মৌলবাদী তত্ত্বে বিশ্বাস করতো না। বড় কোনও আদর্শও তাদের সামনে ছিল না। শত্রুদের স্ত্রী-কন্যা সমেত জেহাদে লুট করা সম্পত্তি, যা 'গণিমতের মাল' বলে চিহ্নিত তার ৪/৫ অংশ লুটেরাদের পাওয়ার কথা। ওই গণিমতের মাল সংগ্রহই উপজাতিদের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং গণিমতের মালের চেয়েও দামী কিছু পেলেই দলপতিদের আনুগত্য পরিবর্তিত হতো। তাছাড়া বেরিলবীর জেহাদের খরচ চালাবার জন্য উপজাতিদের কাছ থেকে 'তোলা' আদায় করতেন। মূলতঃ এই 'তোলা' আদায় ও যৌন বুভুক্ষু হিন্দুস্থানী জেহাদীদের সঙ্গে উপজাতি মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার প্রচেষ্টাই বেরিলবীর কাল হয়ে দাঁড়ায়। ফলে একদিকে বিদ্রোহী উপজাতি ও অন্যদিকে পাঞ্জাবী সৈন্যদলের আক্রমণে পিষ্ট হয়ে বেরিলবীর পতন ঘটে।

বুধ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের পরে বেরিলবী হুন্দ নামক রাজ্যের দলপতি খাদে খাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে সমর্থ হলেন। খাদে খাঁর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে জেহাদীরা হাজারু নামক একটি পাঞ্জাবী গঞ্জে আক্রমণ চালালেন। কিন্তু পাঞ্জাবী সৈন্যদলের পাল্টা আক্রমণে দিশাহারা হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল উপজাতি যোদ্ধারা। দ্বীনান্ধ বেরিলবী ভাবলেন, সৈন্যরা যুদ্ধটিকে ঠিকমত জেহাদ বলে ভাবতে পারছে না বলেই হয়তো যুদ্ধ না করে পালাচ্ছে। কারণ, জেহাদে পলায়ন নিষিদ্ধ। সুতরাং তিনি ইসলামী উম্মার সাহায্য নিয়ে

জেহাদের মধ্যে মুসলিম সমাজকে প্রবিষ্ট করতে সচেষ্ট হলেন। নিজেকে ইমাম বলে ঘোষণা করে ফতোয়া জারী করলেন চতুর্দিকে। সেই ফতোয়াতে বিষোধগার করা হলো যে রণজিৎ সিংহের রাজত্বে মুসলমানরা শরিয়ৎ পালন করতে পারছে না। পারছে না গো-কোরবাণী করতে। উপরন্তু হিন্দুরা মুসলমানদের বিয়ে করছে ইত্যাদি।

এই সবই অমূলক। শরিয়তী ইসলাম ভারতের শহরগুলিতে বিদেশী মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা প্রচলিত ছিল। হিন্দু থেকে ইসলামায়িত নব মুসলমানরা শরিয়ৎ মানতো সামান্যই। স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের পুরুষানুক্রমিক সংস্কারগুলিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেনি। ফলে পাঞ্জাবে বাংলায় নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য ছিল সামান্যই। তাদের মধ্যে বিবাহ একেবারেই অপ্রচলিত ছিল না। মুসলমানের হিন্দু স্ত্রী থাকতো স্বমহিমায়। আবার পাঞ্জাবে হিন্দুর মুসলমান স্ত্রী থাকতো। স্বয়ং মহারাজা রণজিৎ সিংহের বিবি গুলবাহার নাম্নী এক মুসলমান বেগম ছিলেন। আবার গো-কোরবাণী ইসলামে ফর্জ বা অবশ্য কর্তব্য নয়। মুবা—করলে ভাল, না করলেও আপত্তি নেই। পক্ষান্তরে হিন্দুরা বিশ্বাস করতো গো-হত্যা করলে অনন্ত কালের জন্য নরকবাস হয়:

গো-অঙ্গে যত লোম তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর॥[২.২৭]

রণজিৎ সিংহ ইসলাম বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু শরিয়ৎ পালনের নামে অন্য ধর্মের উপর অত্যাচার তিনি বরদাস্ত করতেন না। তাঁর রাজত্বে গোহত্যা নিষিদ্ধ ছিল। গোহত্যা নিষিদ্ধ স্বাধীন ভারতের বহু প্রদেশেও। আর বেরিলবীর জেহাদ উপমহাদেশের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসীকে জিম্মি নামধেয় তৃতীয় শ্রেণীর অধম নাগরিকে পরিবর্তিত করার চক্রান্ত মাত্র।

ইমামত ঘোষণার পরে সীমান্ত অঞ্চলের আশি হাজার অধিবাসী যোগ দিল জেহাদে। যোগ দিল বরকজাই ভ্রাতা ইয়ার মহম্মদ খাঁ ও পীর মহম্মদ খাঁও। উপজাতি ও হিন্দুস্থানী জেহাদীদের মিলিত বাহিনী অগ্রসর হলো নওসেরায় বুধ সিংহের সৈন্যবাহিনীর দিকে। কিন্তু বুধ সিংহ কূটনীতি প্রয়োগ করে ইয়ার মহম্মদের হৃদয় জয় করে নিলেন। ওদিকে হিন্দুস্থান থেকে জেহাদী ও রসদ সরবরাহও কমে গেল। বেরিলবী দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে এখানে ওখানে ঘুরে শেষপর্যন্ত পাঞ্জতারে উপস্থিত হলেন। পাঞ্জতার থেকে তিনি পার্শ্ববর্তী উপজাতি অধ্যুসিত অঞ্চলে প্রচার করতে লাগলেন জেহাদের তত্ত্ব। চিঠি লিখলেন চিত্রল, কাশ্মীর বুখারা প্রভৃতি রাজ্যের শাসকদের কাছেও। হাজারাতে প্রতিষ্ঠিত ছিল হরি সিং নালোয়ার পাঞ্জাবী রাজ্য। সেখানকার অসন্তুষ্ট উপজাতি নেতারাও জেহাদে যোগ দিল। বেরিলবী মনযোগ দিলেন হাজারার দিকে। কারণ হাজারা পার হলেই কাশ্মীরে প্রবেশ করা যায়। আর কাশ্মীরে দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে কাশ্মীরের ভৌগলিক অবস্থানের জন্য সেখান থেকে গোটা উপমহাদেশে দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ হয়ে যাবে।

এর পরের বহু ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী হলো: (১) ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে স্বাত নদীর তীরে কাহারে রোগাক্রান্ত হয়ে আবদুল হাই এর জীবনাবসান। (২) ওই বছরের মে মাসে উসমানজাই এর যুদ্ধে দূররাণী দলপতিদের পরাজয়। (৩) উপজাতিদের পুনরায় দ্বীনমুখী করার জন্য ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে পাঞ্জতারে বিরাট ইসলাম সম্মেলন সংগঠন। ওই সম্মেলনে উপজাতিদের কুসংস্কার ত্যাগ করে শরিয়ৎ মেনে চলার ও জেহাদে যোগদানের শপথ গ্রহণ করানো হয়। যদিও এই

শপথ গ্রহণের ফলাফল স্বাভাবিকভাবেই নগণ্য বলে পরিগণিত হয়েছিল। (৪) নানা কারণে খাদে খাঁর সঙ্গে বেরিলীর মনান্তর ঘটলো। খাদে খাঁ রণজিৎ সিংহের ইটালিয়ান সেনাপতি ভেঞ্চুরার সঙ্গে হাত মেলালেন। ফলে বেরিলবী যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন খাদে খাঁর বিরুদ্ধে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে হুন্দের যুদ্ধে খাদে খাঁ পরাজিত ও নিহত হলেন। হুন্দের সিংহাসন নিয়ে বিবাদে বেরিলবীর বিরোধিতা করতে লাগলেন কিছু দলনেতা। ওইসব বৈরী দলনেতারা হাত মেলালেন ইয়ার মহম্মদ খাঁর সঙ্গে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জাইদার যুদ্ধে নিহত হলেন ইয়ার মহম্মদ। কিন্তু ভেঞ্চুরা পেশোয়ারে থাকার দরুণ জেহাদীরা পেশোয়ার দখল করতে সমর্থ হলো না। (৫) বেরিলবীর ভাইপো স্যায়িদ আহম্মদ আলী আম্বের মধ্য দিয়ে কাগান উপত্যকার ফুলেরা আক্রমণ করতে সচেষ্ট হলেন। কারণ, ফুলেরার মধ্য দিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশ করা যায়। কিন্তু হরি সিং নালোয়ার পাল্টা আক্রমণে দলপতি সমেত প্রচুর জেহাদী নিহত হলো।

ইতোমধ্যে জেহাদীদের কাজকর্মে আবার টনক নড়লো রণজিৎ সিংহের। তিনি কুমার শের সিংহ এবং দুই ইউরোপীয় সেনাপতি অ্যালার্ড ও ভেঞ্চুরাকে পাঠালেন জেহাদ দমনের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দুজন দূতকেও পাঠালেন বেরিলবীর কাছে, পশ্চিম সিন্ধু অঞ্চলে রাজত্ব করতে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে। দ্বীনান্ধ বেরিলবী রণজিৎ সিংহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে উল্টে রণজিৎ সিংহকেই প্রস্তাব দিলেন ইসলাম গ্রহণের। কারণ বেরিলবী তখন পাঞ্জতার থেকে আম্ব পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি।[২.২৮]

বেরিলবী এবার তাঁর রাজত্বে দ্বীনীয় ও সামাজিক সংস্কার শুরু করে দিলেন কোরাণ ও হাদিশের পরিপ্রেক্ষিতে। প্রয়াসী হলেন উপজাতিদের লোকায়ত ইসলামকে শরিয়তীতে পরিবর্তিত করতে। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন সপ্তম শতাব্দীর আরবে। ফলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো তাবৎ উপজাতিরা। এছাড়া ফসলের উপর এক দশমাংস জেহাদী কর তো ছিলই। বৈরী উপজাতিরা হোতি মরদানের আহমদের নেতৃত্বে সংহত হতে লাগলো। আহমদ হাত মেলালেন পেশোয়ারের ইয়ার মহম্মদের ভ্রাতা সুলতান মহম্মদ খাঁয়ের সঙ্গে। কিন্তু মেয়ারের যুদ্ধে সুলতান মহম্মদ খাঁ পরাজিত হলেন জেহাদীদের কাছে। পেশোয়ার চলে গেল বেরিলবীর হাতে (অক্টোবর ১৮৩০)।

বেরিলবী পেশোয়ার দখল করে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। মুদ্রা চালু করলেন নিজের নামে। তাতে ক্ষোদিত হলো—ন্যায়বান আহমদ—যার তরবারীর ঝলক কাফেরদের মধ্যে ধ্বংস ছড়ায়। কিন্তু তিনি পেশোয়ারের শাসক হিসাবে সুলতান মহম্মদকেই বহাল করলেন। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন, বরকজাই ভ্রাতাদের সঙ্গে শত্রুতা ও জেহাদ, দুটি কাজ একসঙ্গে চালানো যায় না। বরকজাই ভ্রাতারা রক্তবীজ—একই পিতার চল্লিশটি পুত্র। একজন মরলে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অনেকজন আছেন।

পেশোয়ার জয়ই বেরিলবীর জীবনে সবচেয়ে বড় জয়। এর ফলে সিন্ধ, হিন্দুস্থান ও কাশ্মীর থেকে দলে দলে মুসলমান যোগ দিল জেহাদে। সাফল্যের গর্বে তিনি যেমন নিজেকে সম্রাট বলে ভাবতে লাগলেন, তেমনই হিন্দুস্থান থেকে আগত জেহাদীরা নিজেদের ভাবতে শুরু করলো এক একটি ক্ষুদে সুলতান বলে। যথেচ্ছাচার শুরু করে দিল তারা। বহুদিন থেকে যৌন বুভুক্ষু এই সব জেহাদীরা দাবী জানালো উপজাতি কন্যাদের বিবাহ করার।

বেরিলবীও তাদের তালে তাল দিলেন। গোটা ব্যাপারটা উপজাতিদের নিজস্ব লোকায়ত সংস্কৃতিতে আঘাত হানলো। বেরিলবীর সমর্থনে কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেছেন, বিবাহের নামে উপজাতিরা তাদের কন্যাদের বয়স্ক লোকের কাছে বিক্রী করতেন। কিন্তু কন্যা বিক্রী করলেও ব্যাপারটা উপজাতিদের একান্তই নিজস্ব। বহিরাগত বেরিলবীর এ ধরণের হস্তক্ষেপে তারা বৈরী হয়ে দাঁড়ালো। রণজিৎ সিংহ উপজাতিদের এই বিরূপ মনোভাবকেই কাজে লাগালেন। বিভিন্ন অঞ্চলে সমবেত জেহাদীদের ওপর উপজাতিদের চোরাগোপ্তা আক্রমণে বহু জেহাদী শহীদ হতে লাগলো। বেরিলবী চলে গেলেন পাঞ্জতারে। সেখান থেকে কাগান উপত্যকা হয়ে রাজদুরাই। ইতোমধ্যে কুমার শের সিংহ পেশোয়ার দখল করে সুলতান মহম্মদকে আবার পেশোয়ারের শাসক করলেন। ওদিকে রাজদুরাইতে বেরিলীর সঙ্গে ভ্রমণরতা তাঁর তৃতীয়া স্ত্রী প্রসব করলেন একটি কন্যা সন্তান। রাজদুরাইতে সদ্য প্রসবা স্ত্রীকে রেখে বেরিলবী সরে গেলেন সাখচুনে।

এবার জেহাদীদের সঙ্গে তঞ্চকতা করলেন জবরদস্ত খাঁ নামে আর এক উপজাতি নেতা। তাঁর কথায় প্ররোচিত হয়ে তথাকথিত 'সৈন্যশূন্য' মুজাফরাবাদ আক্রমণ করতে গিয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো বেরিলবীর। বাকী জেহাদীদের ফিরিয়ে নিয়ে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বেরিলবী চলে গেলেন বালাকোটে।

ওদিকে মুজাফরাবাদ আক্রমণের সংবাদ পেয়ে কুমার শের সিংহ ছুটলেন মুজাফরাবাদে। এবং সেখানে গিয়ে যখন দেখলেন জেহাদীরা সরে গেছে, তখন এগিয়ে গেলেন বালাকোটের দিকে।

শের সিংহ জেহাদীদের সঙ্গে পূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলেন। সেটা উপলব্ধি করলেন বেরিলবী। ফলে দুজনই যথাসম্ভব শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন। কিন্তু উপজাতিদের ক্রমাগত বৈরীতায় বেরিলবীর শক্তি প্রায় তলানীতে এসে পৌঁছেছিল। কাগান উপত্যকার নিম্নদেশে কুঁহার নদীর তীরে বালাকোট। আধা পাহাড়ী গঞ্জ। দুটি টিলার ওপর ছোট দুটি গ্রাম—কালু খাঁ আর মাটিকোট। বেরিলবী আশ্রয় নিয়েছিলেন কালু খাঁ গ্রামের মসজিদে। সঙ্গে কয়েকশো জেহাদী। দুটি টিলার মাঝখানে ধানক্ষেত। পাঞ্জাবী সৈন্যদল যাতে নদীর এপারে না আসতে পারে সেজন্য বেরিলবী কুঁহার নদীর দুটি সেতু ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। মে মাসের তিন তারিখে খবর এলো পাঞ্জাবী সৈন্যদল কুঁহার নদীর অপর পাড়ে এসে পৌঁছেছে। শুভানুধ্যায়ীরা বেরিলবীকে পালিয়ে যেতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু উপজাতিদের উপর্যপরি বিশ্বাসঘাতকতায় ভগ্নহৃদয় বেরিলবী স্থির করলেন, তিনি পালিয়ে যাবেন না। প্রাণ বিসর্জন দেবেন জেহাদে।

৬ই মে কুঁহার নদী পার হয়ে কালু খাঁর দিকে এগিয়ে গেল পাঞ্জাবী সৈন্যদল। মুহুঃ মুহুঃ গোলাবর্ষণ করতে লাগলো মসজিদের ওপর। জেহাদীদের নিয়ে টিলা থেকে সরাসরি ধানক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়লেন বেরিলবী। হাতাহাতি যুদ্ধ চললো পাঞ্জাবী সৈন্যদলের সঙ্গে। প্রায় ছ শো জন জেহাদীর সঙ্গে শহীদ হলেন স্যায়িদ আহমদ বেরিলবী এবং শাহ্ মহম্মদ ইসমাইল। কুমার শের সিংহ বেরিলবীর মৃতদেহের উপর একটি বহুমূল্য শাল বিছিয়ে দিলেন। কারণ বিশ্বমানবতার চোখে বিপথগামী হলেও বেরিলবীর দ্বীননিষ্ঠা অতুলনীয়।[২.২২]

বালাকোটের যুদ্ধ জয়ের সংবাদে আলোকমালায় সজ্জিত করা হলো রাজধানী অমৃতসর। দিল্লীতে এক শ্রেণীর মুসলমানরা মিষ্টান্ন বিতরণ করলেন নিজেদের মধ্যে। বেরিলবীর শরীরের

পতন ঘটলো সত্য। কিন্তু পতন ঘটলো না তাঁর ভাবধারার। নব ইসলামায়িত মুসলমানদের মধ্যে শরিয়তের তত্ত্ব বিস্তারের যে আদর্শ বেরিলবী স্থাপন করেছিলেন সে আদর্শ বিস্তৃত হলো সারা ভারতে।

ওয়াহাবীবাদ[২.৩০]

ওয়াহাবী মতবাদের প্রবর্তক মহম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহাব। ইবন ওয়াহাবের জন্ম ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে। আরবের নজদের অন্তর্গত আয়না শহরে। হানবলী সুন্নী সম্প্রদায়ের এই দ্বীনবেত্তার শিক্ষাদীক্ষা প্রাথমিকভাবে তাঁর পিতার কাছেই। পরে তিনি মক্কা, বাগদাদ ও বসরার ইসলাম-চর্চাকেন্দ্রগুলিতে শিক্ষালাভ করেন ইসলামের নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ। ওইসব শহরের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারগুলিতে নিঃশেষে অন্তস্থ করেন ফিক সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থ। এরপরে যৌবনে উপনীত হয়ে পিতার সঙ্গে তীর্থভ্রমণে নির্গত হন তিনি। মক্কায় হজ করার পর উপস্থিত হন মদিনায়। সেখানে পয়গম্বরের সমাধি দেখে শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে স্থির করেন কিছুদিন সেখানে অতিবাহিত করবেন। সে সময়ে স্যায়িদ আবদুল্লা ইবন ইব্রাহিম ছিলেন মদিনার বিখ্যাত দ্বীন বেত্তা। ইবন ওয়াহাব তাঁরই পদতলে বসে শিক্ষা করলেন ইসলামী নীতি ও স্মৃতিশাস্ত্র। ফলে সম্পূর্ণ হলো তাঁর শিক্ষাদীক্ষা। তিনি ফিরে এলেন স্ব-শহরে। সেখানে প্রচার করতে লাগলেন বিশুদ্ধ ইসলামের কথা।

দেশ বিদেশ ভ্রমন করে বিভিন্ন মানুষকে প্রত্যক্ষ করার ফলে ইবন ওয়াহাব অনুভব করেন, মুসলমানরা সামগ্রিকভাবে পয়গম্বরের মূল একেশ্বরবাদ ভুলে গিয়ে নানা অংশবাদী বিচ্যুতিতে ভুগছে—ঈশ্বরের মহিমা আরোপ করছে কোথাও পীর-ওয়ালী-ফকিরের উপর কোথাও বা সমাধি-দরগা ইত্যাদি স্থাপত্যের উপর। বাস করছে আরও নানাবিধ কুসংস্কারের মধ্যে। সুতরাং তিনি সমস্ত মুসলমানদের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ শেখাতে মনস্থ করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও মানুষ বা স্থাপত্যের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করা পাপ। এ ব্যাপারে তিনি কোরাণ হাদিশকে অভ্রান্ত মেনে বাকী সমস্ত ইসলাম প্রবক্তাদের অভিমত অগ্রাহ্য করলেন।

মহম্মদ-ইবন-আবদুল ওয়াহাবের এই বিশুদ্ধ ইসলাম সবাই গ্রহণ করলো। দিনে দিনে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বেড়েই চললো। তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তায় ত্রস্ত ও রুষ্ট হলেন জেলা শাসক। সুতরাং ইবন ওয়াহাবকে ছাড়তে হলো স্ব-শহর। পাততাড়ি গুটিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন ডেরাইয়াতে। সেখানকার শাসক মহম্মদ-ইবন-সৌদ আশ্রয় দিলেন তাঁকে। শুধু আশ্রয়ই দিলেন না, ইবন ওয়াহাবের পাণ্ডিত্য ও বাগ্মীতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী হলেন। ওয়াহাবের কন্যাকে বিবাহ করলেন সৌদ। ফলে কোরাণ হাদিশের সঙ্গে একত্রিত হলো তলোয়ার। এবার সৌদ নিজেই প্রচার করতে লাগলেন ওয়াহাবীবাদ। দিগ্বীজয় করতে লাগলেন জামাতা ও শ্বশুর। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সৌদের মৃত্যুর পর ওয়াহাবীবাদ প্রচারের দায়িত্বে এলেন সৌদপুত্র আবদুল আজিজ। তাঁর আমলে সমগ্র আরবদেশ ওয়াহাবীদের পদানত হলো। কিন্তু দ্বীনভক্ত আবদুল আজিজ একদিন যখন ডেরাইয়ার মসজিদে নমাজরত ছিলেন তখন একজন ইরানী ঘাতকের ছুরিতে তাঁর জীবনাবসান ঘটলো। ফলে ওয়াহাবীদের নেতৃত্ব দিতে এলেন আজিজপুত্র সৌদ। সৌদই ওয়াহাবীবাদকে ছড়িয়ে দিলেন তুরস্কে। তুরস্কের অটোম্যান সৈন্যদের সঙ্গে কয়েকবার সংঘর্ষও হলো তাঁর। এরপর সৌদ আক্রমণ করলেন মেসোপটেমিয়ার কারবালা। ধ্বংস করলেন যাবতীয় অংশবাদের

চিহ্ন—হুসেনের সমাধি থেকে ছোট ছোট তামাকের পাইপ পর্যন্ত। সেই বছরের শেষে মদিনাও করতলগত হলো সৌদের। সেখানে অংশবাদের যাবতীয় চিহ্নসমেত পয়গম্বরের সমাধিও আক্রান্ত হলো। ধ্বংস করে ফেলা হলো তার গম্বুজের যাবতীয় অলঙ্কার। প্রায় আট বছর ধরে সৌদ মক্কার ইসলামী উম্মার নেতৃত্বে রইলেন। ওদিকে ওয়াহাবীদের সর্বগ্রাসী প্রভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন অটোম্যান সম্রাট। তিনি আলী পাশাকে নির্দেশ দিলেন ওয়াহাবীদের দমন করতে। আলী পাশা ওয়াহাবীদের পরাস্ত করে পুনরুদ্ধার করলেন মক্কা ও মদিনা। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সৌদের মৃত্যুর পর ওয়াহাবীদের নেতা হলেন সৌদের জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুল্লা। তিনি পিতার মত সাহসী হলেও মানুষ চিনতেন না। ফলে তুরস্কের সঙ্গে কয়েকবার যুদ্ধে প্রচুর শক্তিক্ষয় হলো ওয়াহাবীদের। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লা ইব্রাহিম পাশার দ্বারা বন্দী হয়ে নীত হলেন কনষ্টান্টিনোপলে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সেন্ট সোফিয়ার এক চৌকে তাঁর প্রকাশ্য ফাঁসি হলো। এইভাবে নির্মূল হলো ওয়াহাবীদের রাজনৈতিক শক্তি। যদিও তাদের তত্ত্ব আজও জাগরুক আরবের মরুভূমিতে।

ওয়াহাবীরা নিজেদের বলতো মুয়াহিদ বা একেশ্বরবাদী। অন্যদের বলতো মুশরিক বা অংশবাদী।

ওয়াহাবীদের মূল তত্ত্ব গুলি হলো:

(১) তাঁরা আল্লাকে হস্তপদ ইত্যাদি অঙ্গযুক্ত মনে করেন না।

(২) তাঁরা মনে করেন দ্বীনের প্রশ্নে যুক্তি তর্কের কোনও স্থান নেই। দ্বীন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর কোরাণ হাদিশ্ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে।

(৩) আইন প্রণয়নের প্রশ্নে ঐক্যমত কে অগ্রাহ্য করতে হবে। দ্বীনীয় রীতিনীতির সংগ্রাহকের মত গ্রহণীয় নয়। যাঁরা ওইসব মতামতে বিশ্বাস করেন তাঁদের ইসলামে অবিশ্বাসী বলেই গণ্য করতে হবে।

(৪) সর্ববিধ নজিরকে অগ্রাহ্য করতে হবে।

(৫) যে সব মুসলিম তাঁদের মতবাদের শরীক নন তাদের গণ্য করতে হবে ইসলামে অবিশ্বাসী বলে।

(৬) কোনও পীর-ফকিরকে আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ মাধ্যম বলে স্বীকার করা চলবে না।

(৭) পীর ফকিরের মকবারা বা মাজার দর্শন অবৈধ।

(৮) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারুর ভজনা নিষিদ্ধ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুর শপথ নেওয়াও নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ পীর ফকিরের মাজারে-মকবারাতে কোনও রকম উৎসর্গও।

ওয়াহাবী আন্দোলনের সঙ্গে তরিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলনের সাদৃশ্য দেখে বৃটীশ ঐতিহাসিকেরা তরিকা আন্দোলনকে ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলন বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মূল ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল ইসলামের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন আর তরিকা-ই-মহম্মদীয়া ইসলামায়িত হিন্দুদের পূর্ণ ইসলামায়ন আন্দোলন ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এক দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও।

৩ / তিতুমীরের উদ্ভাসের পটভূমি

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে 'তরিকা-ই-মহম্মদীয়া' নামক জেহাদী আন্দোলনের নেতা স্যায়িদ আহমদ বেরিলবীর জীবন ও জেহাদ। হজ যাত্রার প্রাক্কালে স্যায়িদ আহমদ বেরিবলী যখন কলকাতায় আসেন তখন বহু বঙ্গবাসী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইসব শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন মীর নিসার আলী বা তিতুমীর। বাংলার ইতিহাসে তিতুমীরের উদ্ভাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, তিতুমীরই শরিয়তী বিচ্ছিন্নতাবাদী ইসলামের প্রবেশ ঘটান বঙ্গদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিময় সমাজজীবনে। বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচিত হচ্ছে তিতুমীরপূর্ব বাংলার সম্প্রীতিময় সমাজের কথা।

বঙ্গদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এমনই এক সময়ে যখন বিকৃত কিন্তু লোককান্ত বৌদ্ধধর্ম সেন রাজাদের প্রবল উদ্যমে রূপান্তরিত হচ্ছিল হিন্দুধর্মে। এই বৌদ্ধ-হিন্দু মিশ্র ধর্মকেন্দ্রিক সমাজ উৎকৃষ্ট চারণভূমি হয়ে উঠলো ফকির দরবেশ বাহিত ইসলামের কাছে। ওই সময়ে বাগদাদ-বসরার বণিকেরা বছরের পর বছর পণ্যবোঝাই তরী নিয়ে নোঙ্গর করছে দক্ষিণের সমুদ্র বন্দরগুলিতে। তরীগুলি শুধু পণ্য আর বণিকই বহন করছে না, বহন করছে সুফী দরবেশও। তাঁরা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছেন উপকূলের গ্রামগুলিতে—নদীবাহিত হয়ে দেশের অভ্যন্তরে। প্রচার করছেন ইসলামের তথাকথিত সামাজিক সাম্যের কথা।

এই সেমীয় একেশ্বরবাদী মতটিকে সুভাষণ প্রিয় অবতারবাদী হিন্দুরা অন্য অদ্বৈত ধর্মের মতই ভাবলেন। বিশেষতঃ দরবেশরা যখন প্রাথমিকভাবে মারিফতী ইসলামের কথাই বললেন। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের মত জোব্বাধারী ফকির দরবেশরাও প্রচুর সমাদর পেলেন গ্রামীন বঙ্গসমাজে।

সরকারীভাবে বঙ্গদেশে ইসলাম প্রবেশ করে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে, যখন বক্তিয়ার খিলজীর তুর্কী ঘোড়ারা উত্তরবিহার চূর্ণ করে দ্রুতগতিতে আছড়ে পড়ে লক্ষণ সেনের বাসভূমি নদীয়ায়। বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন নৌকাযোগে কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচেন। বক্তিয়ার খিলজী আরূঢ় হন বঙ্গের সিংহাসনে। ফলে রাজশক্তি অনুকূল হয় ইসলামের প্রসার কার্যে। মধ্যযুগে একসময়ে দেখা যায়, স্মৃতিশাস্ত্র কণ্টকিত বাংলাদেশ ছেয়ে গেছে দরগা, মসজিদ আর খানকাতে। ইসলাম প্রসার লাভ করেছে উত্তরের মৈমনসিং-বগুড়া থেকে দক্ষিণের ব-দ্বীপের শেষতম গ্রামটি পর্যন্ত; পূর্বের শ্রীহট্ট-চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমের মঙ্গলকোট অবধি।

বঙ্গদেশে ইসলামের জয়যাত্রা সম্বন্ধে কারুর সম্যক ধারণা ছিল না। কারণ, লোকগণনার বিজ্ঞান তখনও প্রচলিত হয়নি। ফ্রান্সিস বুকানন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লক্ষ্য করেন যে বঙ্গদেশের কৃষকদের বৃহৎ অংশই মুসলমান[৩.১]। ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রথম লোকগণনা হয় এবং এই লোকগণনার ফলে দেখা যায় বঙ্গদেশের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে রাজসাহী, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও বঙ্গদেশের অধিবাসীদের ৪৮ শতাংশই মুসলমান।[৩.২]

গ্রামীন পরিবেশে এই বৃহৎ সংখ্যক মুসলমানের সৃষ্টি সম্পর্কে নানা রকম মতবাদ প্রচলিত আছে। হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথার জন্য স্বধর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিম্নবর্গের মানুষেরা 'সাম্যবাদী' ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে, এই ধরণের একটি সরলীকৃত সিদ্ধান্তের কথা সর্বদা শোনা যায়। এই মতের প্রবক্তারা প্রাথমিকভাবে বৃটীশ আমলারাই। ভারতের দুটি প্রান্তে দুটি শরিয়তী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এই ধরণের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পূর্বের চট্টগ্রাম বিভাগে মুসলমানদের সংখ্যা প্রচুর—যে বিভাগের জেলাগুলিতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের্র হিন্দুরা যথেষ্ঠ সংখ্যালঘিষ্ঠ। কারণ সাধারণভাবে গঙ্গার পূর্ব পার উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে বসতির যোগ্য বলে বিবেচিত হত না। নীহার রঞ্জন রায়ের মতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পীঠস্থান ছিল অজয় নদীর দক্ষিণ তটবর্তী অঞ্চল—যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল নবদ্বীপ। ওই অঞ্চল থেকে যত দূরে যাওয়া যেত সমাজের ওপর থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবও ততো কমতে থাকতো।[৩.৩] সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের ওইসব অঞ্চল ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে বহুদূরে। জঙ্গল হাসিল করে নিম্নবর্ণের মানুষরাই ওইসব অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সংখ্যার আনুপাতিকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে ওইসব নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সম্ভবনাই ছিল যথেষ্ট কম। সুতরাং তথাকথিত উচ্চবর্ণের অত্যাচারের সম্ভবনাই ছিল ন্যূনতম। আবার বঙ্গদেশের যেসব অঞ্চলে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্ভবনা বেশী সেখানে কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা কম। বৃটীশ আমলাদের 'অত্যাচার তত্ত্ব' সত্য হলে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে কোনও নিম্নবর্ণের হিন্দু পাওয়া যেতনা!

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, যে সব স্থানগুলো ব্রাহ্মণেরা ব্রাত্যদের দেশ আর বৌদ্ধ প্রধান বলে ব্রাহ্মণ্য বর্জিত স্থান বলে ঘৃণা করতো, সে সব স্থান আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান প্রধান।[৩.৪] সুতরাং ইসলামায়নের মূলে উচ্চবর্ণের কোনও অত্যাচার নেই, আছে উচ্চবর্ণের অস্মিতা। উচ্চবর্ণের অত্যাচারের তত্ত্ব ভারতবিদ্বেষী মিশনারীমনস্ক বৃটীশ আমলা ও ইতিহাস লেখকদের চক্রান্তের ফসল।

উচ্চবর্ণের অত্যাচারের তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে বেভারলী, ওয়াইজ, রিজলী, হান্টার, গেইট প্রভৃতি আমলাদেরই সৃষ্টি।[৩.৫] এইসব মিশনারীমনস্ক আমলারা গ্রামীন পরিবেশে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করার জন্য অন্যতম তত্ত্ব হিসাবে উচ্চবর্ণের অত্যাচারের তত্ত্ব আমদানী করেছিলেন। এই তত্ত্ব নিতান্তই প্রকল্প মাত্র। আমলারা মূলতঃ ছুঁৎমার্গ ও উচ্চবর্ণের অবহেলার কথাই বর্ণনা করেছেন।

পরবর্তীকালে রামাই পন্ডিতের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের একটি অধ্যায়কে হিন্দুবিদ্বেষী চতুরেরা ধর্মান্তরের কারণের একটি জোরদার নজির হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন। এই কাব্যাংশে নাকি অত্যাচারের তত্ত্ব প্রমাণিত। অনেকে এই নজিরের ফাঁদে পাও দেন।

বিস্তৃত আলোচনার জন্য প্রথমেই উৎকলিত করা যাক ধর্মমঙ্গলের শ্রী নিরঞ্জন উষ্মা অধ্যায়টি :

শ্রীনিরঞ্জনেরা উষ্মা।
জাজপুর পুরবাদি সোলসয় ঘর বেদি
বেদি লয় কর লয় দুন।
দক্ষিণা মাগিতে যায় যার ঘরে নাহি পায়
শাঁপ দিয়া পোড়ায় ভুবন॥
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাইর দিশ পাস।
বোলিষ্ঠ হইল বড় দশবিশ হইয়া জোড়
সধর্ম্মীকে করএ বিনাশ॥
বেদে করে উচ্চারণ বেরায় অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্ফমান॥
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সবে বলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ॥
এইরূপে দ্বিজগণ কয়ে ছিষ্টি সংহারণ
এ বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম মনেতে পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হইল যবনরূপী মাথায়েতে কাল টুপি
হাতে শোভে তীরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদারা বলিয়া এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার হইলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেন দম্মাদার।
যতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা একমন
আনন্দে পরিল ইজার॥
ব্রহ্ম হইলা মহাম্মদ বিষ্ণু হইলা পেগাম্বর
আদম্ফ হইল শূলপাণি।
গণেশ হইল গাজি কার্ত্তিক হইল কাজী
ফকির হইল যত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদা হইলা সেক
পুরন্দর হইলা মৌলানা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সবে
সবে মেলি বাজায় বাজনা॥
আপনি চণ্ডিকাদেবী তিঁহ হইল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হইল বিবিনূর।
যতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিস জাজপুর॥

দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়া কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল॥
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাই পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডগোল॥

তাহার পর অত্যাচারের একটু বিস্তৃততর, বাস্তব ধরনের বর্ণনা,

ব্রাহ্মণের জাতিধ্বংসহেতু নিরঞ্জন
সাম্বাইল জাজপুরে হইয়া যবন।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে গোহাড়ের ঘায়।
হাত পুথি কর‍্যা কত দেয়াসি পালায়।
ভালের তিলক যত পুঁছিয়া ফেলিল
ধর্মের গাজনে ভাই যবন আইল।
দেউল দেহারা যত ছিল ঠাঁই ঠাঁই
ভগ্ন করি পাড়ে তারে না মানে দোহাই।
ধর্মের গাজনে ভাই উড়িছে বলকা
উতরিয়া পেলে তবে যতেক পতাকা॥

সেই তো নগরে দ্বিজ পাশাসিংহ নাম
বেদেতে প্রতাপ অতি রূপে অনুপাম।
শুনিয়া ত ধর্মরাজ কুপিল অন্তরে
সাম্বাইল পাশা ছলে তাহার মন্দিরে।

এই তো গেল "কলিমা জালাল" বা "বড় জাজালি"। তারপর "ছোট জালালি।" ছোট জালালিতে ছড়ার ছন্ত্রের সঙ্গে গদ্যের টুকরো ভাঙ্গা ছন্দে মেশানো আছে। বিভিন্ন ভাষা মিশ্রিত হওয়ার জন্য নিখুঁত অর্থবোধ শক্ত।

• মেয় পুতা সোনার গেঁড়ুয়া খেলে রে আল্লা॥

পশ্চিম দুয়ারে	পণ্ডিত শ্বেতাই	উপরে খাটায়ে টোনা
চারি শাস্ত্র	পঞ্চম বেদ	সে হইল কাজী মৌলনা রে আল্লা
সুবর্ণের বাটিতে	হেড়া রাখি গিয়া	রূপার বাটিতে দুধ
বুক কুড়ি কুড়ি	হয়রানে হিন্দু	হিন্দু মারি গিয়া পুত
দক্ষিণ দুয়ারে	পণ্ডিত নীলাই	উপরে খাটাএ টোনা
চারি শাস্ত্র	পঞ্চম বেদ	সে হৈল কাজী মৌলন রে আল্লা।
রূপার বাটিতে	হেড়া রাখি গিয়া	তাম্বের বাটিতে দুধ
বুক কুড়ি কুড়ি	হয়রানে হিন্দু	হিন্দু মারি গিয়া পুত

গাইল পণ্ডিত রামাই জালালি-পাবন সার
ধর্মের গাজনে পড়ে জয়জয়কার॥

কাব্যাংশগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝে অনেকেই আক্ষরিক অর্থে কাব্যাংশগুলি বিচার

করেছেন। যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন: "ধর্মরাজ যবন হইয়া আইলেন ব্রাহ্মণের উপদ্রব নিবারণের জন্য। এ সকল কথার অর্থ কী? এই যে জাজপুরের নাম হইতেছে, এ কোন জাজপুর? উড়িষ্যার রাজধানী জাজপুর নহে, কারণ উড়িষ্যায় ধর্মঠাকুরের বড়ো একটা প্রাদুর্ভাব নাই। ইহা মানিক গাঙ্গুলীর জাজপুর, এখানে ধর্মের নাম দেহার, ইহা বঙ্গে রাঢ়ে। জাজপুর অঞ্চলে যখন মুসলমান আসে, তখন ধর্মঠাকুরের ভকতেরা তাহাদের সঙ্গে মিশেন ও মিশিয়া ব্রাহ্মণদের জব্দ করেন।"[৩.৬] বা "ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের ফলে ধর্মঠাকুর সংধর্মীদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হিন্দু দেবদেবীগণের রূপান্তর ঘটিল। যেমন ধর্ম যবনরূপী হইলেন, বিষ্ণু পয়গম্বর, ব্রহ্মা পাকাম্বর, শূলপাণি (শিব) আদম। গনেশ গাজী, কার্তিক কাজী। মুনি ফকির, চণ্ডিকা দেবী হায়া বিবি (আরবী Hawwa, হওওয়া Eve, আদিনারী), পদ্মাবতী বিবি নূর (জ্যোতি) প্রভৃতি। এইরূপে হিন্দু দেবদেবীগণ ইসলামের বেশ পরিয়া জাজপুরে প্রবেশ করার পর একাধিক মন্দির ধ্বংসের কারণ হইয়া তাণ্ডবের সৃষ্টি করিয়াছেন।"[৩.৭]

অন্যদিকে তীক্ষ্ণধী মুসলমান লেখকগণ শূন্য পুরাণের এই কাব্যাংশগুলি লুফে নিয়েছিলেন অত্যাচার তত্ত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ হিসাবে। কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন:

The followers of the Vedas became very powerful, they went out in bands and destroyed the Buddists. Dhamma (the presiding Deity of the Buddhist) was greatly pained at all these and assumed in his mystery the forms of Mussalman with black cap on their heads and bows and arrows in their hands. They rode powerful horses which struck terror on all sides, and they cried out one name, 'Khuda.' Brahma become Mahammed, Vishnu became the prophet and Siva became Adam: Genesh became Gazi and Kartik became the Qazi and all the ancient Rishis became Faqirs and Darveshes—the goddess Chandi became Hava (Eve) and Padmavati became the Lady of Light (Fatima, daughter of the Propet). All the gods and goddess entered Jajpur (a big village) in a body. They went on pulling down walls and gates. feasted merrily upon booty and cried out—catch them, catch them."[৩.৮]

ডঃ ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন, শূন্য পুরাণের নিরঞ্জন রুস্মায় সদ্ধর্মীরা মুসলমানদের মুক্তিদূত রূপে দেখেছেন।[৩.৯]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মঠাকুরের নিরঞ্জন নাম এবং সধর্ম কথাটি দেখে মনে করেছেন এটি বৌদ্ধ ধর্মেরই অনুবৃত্তি। কিন্তু বর্তমান প্রাপ্ত তথ্যগুলি শাস্ত্রী মহাশয়ের মত সমর্থন করে না। সুকুমার সেন মনে করেন, ধর্ম বৈদিক দেবতা কিন্তু প্রাপ্ত পূজাপদ্ধতিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ধর্মের অনুষ্ঠান গৃহীত। অর্থাৎ ধর্ম উপাসনা একটি মিশ্র উপাসনা। অনেকের মতে ধর্ম আদিবাসীদের দেবতা পরে সাংস্কৃতায়ন ঘটে হিন্দুধর্মে গৃহিত হয়েছে।[৩.১০]

ধর্মঠাকুর যাই হোন না কেন—উৎকলিত কাব্যাংশগুলিতে মুসলমানদের অত্যাচারী হিসাবেই দেখানো হয়েছে, মুক্তিদাতা হিসাবে নয়। তারা মঠমন্দির ধ্বংস করছে। ব্রাহ্মণরা পালাচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের হত্যা করছে, এ চিত্র নেই। মঠ-মন্দির ধ্বংসের ক্ষতি সমগ্র হিন্দু সমাজের, ব্রাহ্মণদের একার নয়। রামাই পণ্ডিত সামগ্রিক ভাবে হিন্দু বিরোধী নন।

কারণ তাঁর কাব্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি পৌরাণিক দেবতারাই পরিবর্তিত হচ্ছেন যবন রূপে।

কাজী আবদুল ওদুদের বক্তব্যের মধ্যে মজার স্ববিরোধীতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম বৌদ্ধদের দেবতা। কিন্তু হিন্দুদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরই পরিবর্তিত হচ্ছেন যবন রূপে। তারাই দমন করছেন বৌদ্ধ শত্রু ব্রাহ্মণদের। সাম্প্রতিক কালে এক পন্ডিত কাজী সাহেবেরর বক্তব্য উৎকলিত করেছেন।[৩.১১] আজকাল কিছু হিন্দু সন্তান নিজেদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করতে তৎপর বটে। তবে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এ ধরণের তৎপরতা দেখাতেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

অন্যদিকে Cambridge History of India তাদের মিশনারী মনস্কতা বজায় রেখেছেন নিরঞ্জন উষ্মায় ব্যাখ্যায়:

The annals of Bengal are stained with blood, and the long lists of Muslim Kings contains the names of some monsters of cruelty, but it would be unjust to class them as uncultured bigots void of sympathy with their Hindu subject. Some certainly reciprocated the attitude of the lower caste of the Hindus, who welcomed them as their deliveres from the pristly yoke, and even described them in popular poery as the gods, came down to earth to punish the wicked Brahmins.[৩.১২]

জগদীশ নারায়ণ সরকার নিরঞ্জন উষ্মার সারাংশ লিখে মন্তব্য করেছেন, "এইরূপে সামাজিক উৎপীড়ন এড়াইতে নিম্ন গোত্রেরা লোকেরা ইসলামকে স্বাগত জানান।" অথচ উনি নিজেই আগে লিখেছেন, "পূর্বভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম কোনও দিনই সকল স্তরের উপর সমান দৃঢ় ভাবে প্রাধান্য করিতে পারে নাই। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ন্যায় সেখানে হিন্দুধর্ম সুসংঘটিত ও সংবদ্ধ ছিল না। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা পরিপূর্ণরূপে হিন্দুধর্মানুগ ছিল না।"[৩.১৩]

যেখানে মানুষেরা পরিপূর্ণরূপে হিন্দুধর্মানুগ ছিল না, ছিল না ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য, সেখানে ব্রাহ্মণরা কিভাবে সামাজিক উৎপীড়ক হতে পারে?

আমাদের পন্ডিতদের ইতিহাস চর্চা এই রকম স্ববিরোধীতার মধ্যে নিবদ্ধ।

এবার রামাই পন্ডিতের কাব্যাংশগুলির পর্যালোচনায় আসা যাক। কাব্যাংশে বর্ণিত জাজপুর ছিল উড়িষ্যার মন্দির নগরী, সনাতন ধর্মের পীঠস্থান। মুসলমান আক্রমণে জাজপুর ধ্বংস হয়ে যায়। সুকুমার সেন লিখেছেন, চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর সুলতান ফিরোজশাহ তোগলক উড়িষ্যা ও বাংলায় যে বিদ্যুৎ গতি আক্রমণ চালিয়েছিলেন, মনে হয় সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি জাজালি কলিমার বিষয় বস্তু।[৩.১৪]

Cambridge History of India র মত, ফিরোজশাহ্ তোগলক নয়, স্যামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ জাজপুর ধ্বংস করেছিলেন।[৩.১৫]

হিন্দুরা কর্মফলবাদী। ভালমন্দ সবকিছু মূলেই কর্মফলের অনুসন্ধান করে। মুসলমান আক্রমণের মূলে অবশ্যই কারুর কৃত কোনও পাপ। এক্ষেত্রে পাপের দায় চাপানো হয়েছে জাজপুরের অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণদের উপর। তারা দক্ষিণার জন্য 'জুলুম' করে। উঞ্ছজীবি এইসব অগ্নিহোত্রী

ব্রাহ্মণদের ভরণ পোষণের দায়তো সাধারণ নাগরিকদের উপরই ন্যাস্ত ছিল। সেই দায় সবার কাছে প্রীতিপ্রদ নাও হতে পারে। এটাকে তারা মনে করতে পারে জুলুম বলে। তাছাড়া রামাই পন্ডিতের ব্রাহ্মণ বিরোধী মানসিকতার সূত্র অন্যত্র নিহিত। রামাই পন্ডিতের রচনাতেই আছে, মর্তলোকে পূজা পাবার জন্য ধর্মঠাকুর জাজপুর নিবাসী রামাই পন্ডিতকে অনুগ্রহ করলেন। 'অনুপবীতি' রামাইকে মুনিরা তাঁর মামা মার্কন্ডেয়ের চাপে পড়ে একঘরে করেছিলেন। ধর্মঠাকুর স্বয়ং রামাইকে তাম্র-উপবীত দিয়ে নিজের পূজক বলে ঘোষণা করলেন। এবং তাঁকে হেনস্তা করার জন্য শাস্তি হিসাবে মার্কন্ডেয়ের শরীরে উৎপন্ন করলেন কুষ্টরোগ। অবশেষে রামাইকে স্বীকার করে এবং ধর্মঠাকুরের পূজা করে মার্কন্ডেয়ের রোগমুক্তি ঘটলো।[৩.১৬]

সুতরাং মুসলিম আক্রমণের দায়টা যে ব্রাহ্মণদের দ্বারা একদা অপমানিত রামাই পন্ডিত অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণদের উপরই চাপাবেন, এটা তো স্বাভাবিক।

এর পরের ঘটনা বিদেশীর পীড়নকে সুমিষ্ট তবকে মুড়ে গলাধকরণ করা। এটিও কর্মফলবাদী হিন্দু মনের বিচিত্র ফসল। সেখানে অত্যাচারী যবন ধর্মঠাকুর হয়ে যায়, ইংরেজ হয়ে যায় স্বর্গের যতেক দেবতা:

অপূর্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে
বিলাতে হইলা সাহেবরূপী
ছাড়িলা আহ্নিকপূজা পরিধান কুর্ত্তি মুজা
হাতে বেত শিরে দিলা টুপী।
বাঙ্গালার অভিলাষে আইলা সদাগর-বেশে
কৈলকাতা পুরানা-কুঠী আদি
গত আমল সুবেদারী শুভ সন বাহাত্তরি
আংরেজ-আমল তদবধি॥[৩.১৭]

বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়ার এই পদ্ধতির নাম সন্নিপাতন (syncretism)। সন্নিপাতনের উদাহরণ ওয়াহাবীপূর্ব বঙ্গদেশের সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। কিছু পরেই উল্লিখিত হবে সন্নিপাতনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে ফৈজুল্লার পুঁথির অংশ বিশেষ। অন্য এক সন্নিপাতী কাব্যের দুটি পংক্তি হলো:

সত্য পীর বলি সবে শিরে দিবে হাত।
নারায়ণ বলিয়া করিবে প্রণিপাত॥

আর জাজপুর যে কোনও গ্রাম নয়। যথার্থই উড়িষ্যার জাজপুর। কারণ ধর্মমঙ্গলে গৌড় থেকে জাজপুরের পথ নির্দেশ আছে:

একে একে গ্রাম এড়াইয়া গেল দূরে
তরাতরি আইলেন বর্ধমান শহরে।
অসুরগণ মাখালঘাট আইল এড়াইয়া
নারায়ণ গড়ে পন্ডিত উত্তরিল গিয়া।
চিড়াকুটি ধামোনগর কল্যাণগড় দিয়া
জাজপুর নগরে পন্ডিত উত্তরিল গিয়া।

সুতরাং সব মিলিয়ে রামাই পন্ডিতের রচনা উচ্চবর্ণের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বা হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে বৌদ্ধদের ইসলাম বন্দনার কোনও নিদর্শন

নয়। বীভৎস মুসলিম আক্রমণের স্মৃতি মাত্র। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের অত্যাচার অপেক্ষা মুসলিমদের বর্বর ধ্বংসলীলা অনেক বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণিত হয়েছে জালালি কলিমাতে।

বস্তুতঃ জাতিভেদ প্রথা নয়, হিন্দুদের ছুৎমার্গ ও স্মার্ত পন্ডিতদের শম্বুক মনস্কতা ইসলামায়নের জন্য কিছুটা দায়ী। হিন্দুদের 'জাত' অতি সহজেই যায় এবং একবার জাত গেলে তা ফিরিয়ে আনা সহজসাধ্য নয়। তার জন্য প্রয়োজন প্রায়শ্চিত্তের। রবীন্দ্রনাথের পরিবার পীরালী ব্রাহ্মণ বলে কথিত। কবে কোন মুসলমানের রান্নার গন্ধ নাকি তাদের বাসগৃহে প্রবেশ করেছিল। সেজন্য কোনও সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন না।

মুসলমান শাসক সম্প্রদায় ও ইসলাম প্রচারকেরা হিন্দুদের এই জাত যাওয়ার ব্যাপারটিকেই তৎপরতার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে এক বিরাট সংখ্যক হিন্দুকে ইসলামায়িত করেন।

গরু ভারতীয় সভ্যতার প্রথম স্তর থেকেই অবধ্য ছিল না। বেদে গোমাংস আহুতি দেওয়ার করা আছে। আবার গরু 'অঘ্না' বলাও আছে। বেদ-বেদান্ত-রামায়ণ-মহাভারত সেমীয় রিলিজিয়নগুলির কেতাবের মত অল্প কয়েকজনের স্বল্পকালীন রচনা নয়, যুগ যুগ ধরে বহুজনের ভাবনাচিন্তার ফসল। মহাভারতের শান্তিপর্বে মহারাজ রন্তিদেবের বৃত্তান্তে আছে, রন্তিদেব অসংখ্য গোহত্যা করে অতিথি সৎকার করতেন। সুতরাং ভারতীয় জীবনে একদা গোহত্যা প্রচলিত থাকলেও পরবর্তী কালে তা অপ্রচলিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত পাপকর্ম বলে চিহ্নিত হয়। ধীরে ধীরে মহিমান্বিত হতে থাকে গরু। কালিদাসের কাব্যে নন্দিনী বন্দনা তৎকালীন সমাজে গরুর মাহাত্ম্য সূচিত করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীকূলের বিবর্তন ঘটে, একথা বৈজ্ঞানিক সত্য। একদা বন্য গরু ধীরে ধীরে মানুষের গার্হস্থ্যজীবনের সাথী বলে পরিচিত হতে থাকে। গরুর সঙ্গে মানুষের গড়ে ওঠে সহমর্মিতা। বস্তুতঃ মনুষ্যেতর জীবের সঙ্গে সহমর্মিতা হিন্দুমনের একটি বিশেষত্ব। গরু-কুকুর বিড়াল ইত্যাদি গৃহপালিত জীব যে শুধু অবধ্য তাই নয়, এদের নিত্য খাদ্য পানীয় প্রদান করা বেদ নির্দেশিত।[৩.১৮] পৃথিবীটা শুধুমাত্র মানুষের জন্য নয়—পরিবেশবিজ্ঞানের এই আধুনিক তত্ত্বটি হিন্দুধর্মের নিগদিত সার। এছাড়া মনস্তত্ত্বের দিকও আছে। কুকুর ও গরু মানুষের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করতে অনেকাংশে সক্ষম। তারা মানুষের হাবভাব আচার আচরণ অনুধাবন করতে পারে। মানুষের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হয়। যাঁরা পুরুষানুক্রমে গরু ও কুকুর প্রতিপালন করে আসছেন এ সত্য কেবলমাত্র তাঁদেরই উপলব্ধ। শরৎচন্দ্রের মহেশ মানুষ ও গরুর সহমর্মিতার অপূর্ব নিদর্শন। আর কুকুরের সঙ্গে মানুষের সহমর্মিতার জন্য শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করা দরকার। শরৎচন্দ্রের কুকুরপ্রেম ঐতিহাসিক। বস্তুতঃ একজন ইংরেজের জীবনে কুকুরের যে স্থান একজন হিন্দুর জীবনে গরুরও সেই স্থান। একদা কেল্টিক উপজাতির বন্য মানুষেরা তাদের শিকারজীবনের সাথীটিকে যেমন ভুলতে পারেনি, সাদরে স্থান দিয়েছে তাদের ড্রইংরুমে। হিন্দুরাও তেমন ভালবেসেছে, তাদের কৃষিজীবনের অত্যাবশ্যকীয় সাথীটিকে। তবে আপন প্রিয় পশু সম্বন্ধে ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হলো, দ্বৈতবাদী খৃষ্টান ইংরেজ কুকুরকে মনুষ্য প্রতিম মনে করে। আর অদ্বৈতবাদী হিন্দুরা যেহেতু সর্বভূতে ঈশ্বরত্ব অনুভব করতে পারে, সেহেতু গরু তাদের কাছে দেবপ্রতিম। একজন ইংরেজের পক্ষে যেমন একটি কুকুরকে হত্যা করা সম্ভব নয়, একজন হিন্দুর পক্ষে তেমনই

অসম্ভব একটা গরুকে হত্যা করা। হিন্দুগৃহে সন্তানদের যেমন নাম থাকে, গৃহপালিত গরু, কুকুর ও বিড়ালেরও তেমনই একটি করে নাম থাকে। তারাও অপত্যস্নেহের অংশীদার।

গোজাতি সম্বন্ধে হিন্দুদের এই অপরিসীম দুর্বলতার কথা ভারত আক্রমণকারী বিদেশী মুসলমানরা সহজেই অনুধাবন করেন। সুতরাং তাঁরা হিন্দুধর্মে আঘাত হানার জন্য গোহত্যাকেই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলে বেছে নেন। গোহত্যা সম্বন্ধে মুজাদ্দিদ অ্যালফ-স্যানীর প্ররোচনামূলক বক্তব্য পূর্ব পরিচ্ছেদেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এখন দেখা যাক গোমাংসকে ইসলামায়নের কাজে ইসলাম প্রসারকরা কিভাবে ব্যবহার করতেন।

আমরা আগেই জেনেছি, ইসলাম গ্রহণের জন্য কয়েকজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে কলেমা উচ্চারণ করাই যথেষ্ট। কিন্তু উপমহাদেশে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়া হলো কলেমা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গোমাংস ভক্ষণ করানো এবং সেই সংবাদ ব্যাপক ভাবে প্রচার করা। সাধারণ গ্রাম্য হিন্দুরা ইসলামায়নকে 'গোমাংস খাইয়ে দিয়েছে' বলে বর্ণনা করেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এইভাবে জাতিচ্যুত করে ইসলামায়িত করার ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের নগর সংকীর্তনের সংবাদে কুপিত হয়েছেন কাজী:

ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥
এতকালে কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানী।
এবে যে উদ্যম চালাও কোন বলি জানি॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগি পাইমু।
সর্বস্ব দন্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥[৩.১৯]

আবার:

পূর্বে যবে সুবুদ্ধি ছিল গোড়ী অধিকারী।
সৈয়দ হুসেন খাঁ করে তাহার চাকুরী॥
দীঘি দেখাইতে তারে মনসীব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে হুসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল।
সুবুদ্ধি রায়ের তবে বহু বাড়াইল॥
তাঁর স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্ন।
সুবুদ্ধি রায়েরে মারিতে কহে রাজা স্থানে॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে ইঁহা নাহি জীবে॥
স্ত্রী মারিতে চায় রাজা সঙ্কটে পড়িল।
করোয়ার পাণি তার মুখে দেয়াইল॥

করোয়ার পাণি গোমাংস স্পর্শিত। সুতরাং জাত গেল সুবুদ্ধি রায়ের। সুবুদ্ধি রায়

প্রায়শ্চিত্ত পুছিল পণ্ডিতের থানে।
তাঁরা কহেন তপ্ত ঘৃত খাইঞা ছাড় প্রাণে॥[৩.২০]

তপ্তঘৃত খেয়ে প্রাণত্যাগ করার চেয়ে ইসলাম গ্রহণ যে বহুলোকের কাছে শ্রেয় মনে হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের অনেক পূর্বেই অষ্টম শতাব্দীতে আরব বণিকদের সঙ্গে ইসলাম বঙ্গদেশে প্রবেশলাভ করে।[৩.২১] কিন্তু বণিকদের সঙ্গে আগত সমকালীন ইসলাম প্রচারকেরা যে খুব বেশী সুবিধা করতে পেরেছেন, এমন তথ্য পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশে মূলতঃ পীর-ফকিরদের দ্বারাই ইসলাম প্রসারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মারিফতী ইসলামের সঙ্গে ভারতে প্রচলিত বৌদ্ধ ও সনাতন ধর্মের কোনও বিরোধ নেই, একথা আগেই উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু মারিফতী ইসলামের প্রচারক হলেও এই পীর ফকিররা প্রথমতঃ এবং শেষতঃ মুসলমান। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে শরিয়তী ও মারিফতী ইসলাম চুম্বকের দুটি মেরুর মত মনে হলেও প্রত্যেক সূফী সাধকই সমভাবে শরিয়ৎ সচেতন। তিতুমীরের আন্দোলনেই আমরা দেখবো আন্দোলন কট্টর শরিয়তী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের দলে যোগ দিচ্ছেন কয়েকজন স্থানীয় ফকির। এই পীর-ফকিররাই ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বতোভাবে বিরোধিতা করেছেন।[৩.২২]

বঙ্গদেশে এই বিপুল সংখ্যক মুসলমানের উদ্ভব অবশ্যই ইসলামায়নের দ্বারা। খোন্দকার ফজলে রাব্বি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে মুসলমানদের অধিকাংশই বিদেশ থেকে আগত স্থানীয় শাসনকার্যে রত পশ্চিমাদের বংশধর। কিন্তু রাব্বির মত শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয় নি। এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে বঙ্গদেশী মুসলমানদের বারো আনাই ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ এবং হিন্দু। এবং কিছু কিছু উপজাতীয় মানুষ—কোচ, মেচ, রাজবংশী, বোড়ো, ধীমল প্রভৃতি।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিপুল সংখ্যক মানুষ কেন ইসলামায়িত হলো, এবং কীভাবে? নিছক উচ্চবর্ণের অত্যাচারের জন্য যে নয় তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। তবে কি নিম্নবর্ণের হীনতাবোধের জন্য?

ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ নিম্নেতর হিন্দুদের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন তাঁরা জানেন, আপন আপন বর্ণ সম্বন্ধে সংস্কার ও জাতিবিভাগে বিশ্বাস এদের মধ্যে যথেষ্ট প্রবল। নিম্নবর্ণের বলে কেউ নিজেকে ঘৃণ্য মনে করেন, এ ধারণা অমূলক। তথাকথিত ঘৃণার ধারণা 'ভদ্রলোকদের' ঢুকিয়ে দেওয়া। স্ববর্ণ সম্বন্ধে হীনতাবোধ থাকলে পূর্ববঙ্গের অজস্র নমঃশুদ্র ও চন্ডালরা সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে আসতেন না। মুসলমান হয়ে স্বচ্ছন্দেই বাংলাদেশে বাস করতেন। আসলে হিন্দু ধর্মবোধটাও স্তর ভিত্তিক। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ধর্মের বোধও বিভিন্ন। সংস্কৃতি অনুযায়ী বৈদিক, বৈদান্তিক, পৌরাণিক, লৌকিক, প্রকৃতি পূজা, ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের হিন্দুধর্ম সমাজের বিভিন্ন স্তরে পরিব্যাপ্ত। চট্টগ্রাম বা নোয়াখালি জেলার নিম্নবর্গের হিন্দুদের ধর্মবোধ নিঃসন্দেহে বৈদিক বা বৈদান্তিক ছিল না। এমনকি পৌরাণিকও নয়। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের তুলির সামান্য টানের সঙ্গে সে অঞ্চলে যা প্রচলিত ছিল তা হলো, তন্ত্রমন্ত্র ও শীতলা মনসা দক্ষিণরায় পূজা। লৌকিক হলেও সে ধর্ম ছিল অদ্বৈত ধর্মই। শীতলা, মনসা, দক্ষিণরায় জাতীয় দেবদেবীর পূজার মাধ্যমে অনন্ত ব্রহ্মেরই উপাসনা করতো মানুষ। যদিও সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে সব মানুষই

অমৃতের পুত্র, কিন্তু সব মানুষকে একই স্তরের ধর্মের পতাকাতলে আনার প্রয়াস নিমাই মিশ্রের আগে কেউ করেননি। কিন্তু সেই নিমাইকেও হুসেন শাহী বাংলা ছেড়ে উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের রাজত্বে চলে যেতে হয়েছিল। সুতরাং উচ্চস্তরের হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন ব-দ্বীপের নিম্নাংশের হিন্দুরা নানারকম ধর্মীয় আচার অনাচারের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করতো। ওদিকে বৌদ্ধধর্মের তখন শেষের ঘন্টা বেজে গেছে। বৌদ্ধরা হয়েছে নানা তন্ত্রমন্ত্রের পূজারী। ধর্মরাজের উপাসক ও তন্ত্রমন্ত্র শীতলা মনসার পূজারী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিই মনোরম শস্যক্ষেত্র হয়ে উঠলো ইসলামের কাছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল চেঙ্গিস খাঁর (সম্ভবতঃ বৌদ্ধ) মধ্য এশিয়া আক্রমণ করার ফলে বহু মুসলমান বিতাড়িত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। এদের মধ্যে বহু সুফী দরবেশও ছিলেন। সেই সুফী দরবেশরাই ভারতে ইসলাম প্রসারের মুখ্য ভূমিকা নেন। নদীবহুল বঙ্গদেশের দুর্গম অঞ্চলে নৌকা ভিড়িয়ে দিয়ে তাঁরা উপস্থিত হন অখ্যাত অনাদৃত মানুষদের কাছে। ছলে-কৌশলে ইসলামায়িত করেন তাদের।

এই সুফী ইসলাম প্রসারকেরা দেখেন শুধুমাত্র তরবারির জোরে ভারতে ইসলাম প্রচার সম্ভব নয়। কারণ, হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠরা সবাই নির্বোধ বা কাপুরুষ নন। সুফী সাধক নিজামুদ্দিন আউলিয়া এ ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করে বললেন, হিন্দুরা আল্লাহর কৃপা থেকে বঞ্চিত। অনেক দিন মুসলিম সন্তদের সংস্পর্শে না থাকলে তারা সহজে ইসলামায়িত হবেন না।[৩.২৩] বলা বাহুল্য হিন্দুদের মুসলিম সন্তদের সংস্পর্শে রাখার দায়িত্ব নিজামুদ্দিন আউলিয়া নিজের হাতেই নিলেন।

বঙ্গদেশে সুলতানী আমলে ইসলামায়িত করার জন্য বেশ কিছু বলপ্রয়োগ হয়েছিল। চাকরী ও অন্য নানারকম সুযোগ সুবিধা অর্জনের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল মধ্যবিত্তদের অনেকে এবং উচ্চবিত্ত ও জমিদারদের কেউ কেউ। পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা হোসেন শাহের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ ভ্রমণ করেছিলেন। বারবোসা তাঁর ভ্রমণ বিবরণে লিখেছেন: "(বাংলাদেশে) পৌত্তলিক অধ্যুষিত এক বিরাট অঞ্চল ছিল। তাদের (হিন্দুদের) মধ্যে প্রত্যেক দিন বহু লোক রাজা এবং শাসনকর্তাদের আনুকূল্য অর্জনের জন্য মূর (মুসলমান) হয়ে যেত।" টাসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অসীম রায় তাঁর বইতে এক দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন মধ্য ও উচ্চবিত্তদের এই ধরণের ইসলামায়িত হওয়ার ঘটনার।[৩.২৪] এছাড়া প্রেমজ কারণে অনেকে ইসলামায়িত হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু মূল ইসলামায়ন সুফীদের দ্বারাই ঘটেছিল।

তৃপ্তি ব্রহ্ম[৩.২৫] একজন সুফি পীরের নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলির কথা বলেছেন:

(১) জাতিধর্ম নির্বিশেষে পীরের দরগায় সবাই আসে। মানসিক করে এবং মানসিক পরিশোধ করে।

(২) মুসলমান খাদেম (পুরোহিত ও দেয়াসী) গণ সবাইকে শান্তিজল ও প্রসাদ বিতরণ করে থাকেন।

(৩) গাছ-গাছড়া জাত ওষুধ ও মাদুলী কবচ ইত্যাদি দিয়ে থাকেন।

(৪) তেল পড়া জলপড়া ইত্যাদিও দেওয়া হয়।

(৫) দরগাহে কোরাণ পাঠ হয়।

(৬) পীরের দরগায় ধূপ-দীপ বাতি সহ শিরণী (বাতাসা, ফুল ইত্যাদি) দেওয়া হয় এবং ভক্তের দল হাঁটুমুড়ে বসে মাথায় টুপী বা কাপড় লাগিয়ে দু-হাত সামনে প্রসারিত

করে উপাসনা করে ও মাথায় হাত লাগায়।

(৭) পীরের মৃত্যুবার্ষিকী বা উরস উপলক্ষে বাৎসরিক মিলন ও মহামেল হয়ে থাকে এবং দরগাহের সেবায়েতগণ অতিথি সংকার করে থাকেন।

(৮) হিন্দু আদর্শে হরির লুটের মত লুট দেওয়া হয় এবং হাজত মানত ও শিরনী দেওয়া হয় মাজারে।

(৯) সন্তান কামনায় এবং রোগ নিরাময়ের আকাঙ্ক্ষায় দরগায় ইট বাঁধা হয়, ফুল প্রদত্ত হয়।

(১০) হাজত বা মানসিক—মুরগী ছাগল ইত্যাদি পীরের স্মরণ উদযাপন করে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

(১১) হিন্দুর দেবদেবীর আদেশ প্রাপ্ত ভক্তগণ পীরের নামে মূর্ত্তিপূজা বা গীতি স্তোত্র পাঠ করলেও দরগাহে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন নেই।

(১২) দরগাতে পীরের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে জিয়ারত করার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট মোনাজাত করা হয়।

(১৩) পীরের স্থানে পাঁঠাবলি নিষিদ্ধ।

(১৪) মানিক পীরের গানে গরু ও গরুর গোয়ালের উন্নতির দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। গরুর রোগ নিরাময়ের জন্য মানিক ভক্তরা হিন্দু গৃহস্থদের ঔষধ (গাছ-গাছড়া, ধূল-ফুল ইত্যাদি) দিয়ে থাকেন।

তৃপ্তি ব্রহ্ম আরও লিখেছেন, পীরের প্রতি ভক্তি এদেশের জনমানসের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। মূলে আছে যোগী, তান্ত্রিক ও সিদ্ধাই এর প্রতি সুদৃঢ় মোহ।

গিরীন্দ্র নাথ দাস তার 'পীর সাহিত্যের কথা'তে পীর-ফকিরদের অলৌকিক ক্ষমতার অজস্র নিদর্শন রেখেছেন।[৩.২৬] বাংলাতে প্রবাদই আছে, ঝড়ে কাক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে। লোকসাহিত্যও ভরপুর এইসব ফকিরী কেরামতিতে। মৈমনসিংহ গীতিকার লীলা-কঙ্ক উপাখ্যানে আছে যবন পীরের আগমন বিষয়ক গান:

এমন সময়ে কিবা হইল বিবরণ।
কহিব সকল সবে শুন দিয়া মন॥
সারগিদ লইয়া পঞ্চপীর একজন।
গোচারণ মাঠে আসি দিল দরশন॥
বটগাছের তল খানি চাঁচিয়া ছুলিয়া।
বাস করে পীর দরগা স্থাপন করিয়া॥
নামি ডাকি পীর তার বড় হেকমত।
ধূলা দিয়া ভাল করে আইসে রোগী যত॥
অন্তরের কথা নাহি দেয় বলিবারে।
আপুনি কহিয়া যায় অতি সুবিস্তারে॥
মাটী দিয়া বানায় মেওয়া কিবা মন্ত্রবলে।
শিশুগণে ডাকি তবে হস্তে দেয় তুলে॥
অবাক হইল সবে দেখি কেরামত।
দর্শন মানসে লোক আসে শত শত॥

যে যাহা মানত করে সিদ্ধি হয় তার।
হেকমত জাহির হইল দেশের মাঝার॥
চাউল কলা কত সিন্নি আইসে নিতি নিতি।
মোরগ ছাগল কইতর নাহি তার ইতি॥
সিন্নির কণিকামাত্র পীর নাহি খায়।
গরীব দুঃখীরে সব ডাকিয়া বিলায়॥[৩.২৭]

এ সমস্ত পাঠ করে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে দাঁড়িয়ে একজন বিজ্ঞানবাদী মানুষ সহজেই বুঝতে পারবেন, নানারকম কুসংস্কারে আবদ্ধ দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে প্রলোভন ও তঞ্চকতার আবেশের মধ্যে টেনে এনে পীর-ফকিরের মাহাত্ম্য দেখিয়ে মগজ ধোলাই করা হতো। তারপর কলেমা ও গোমাংস।

উনবিংশ শতাব্দীতে ওয়াহাবী, ফরাজী ও অন্যান্য শরিয়তী আন্দোলনের ফলেও চাপে পড়ে বহু লোক ইসলামায়িত হয়। সাজন গাজীর গান ও সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় তিতুমীর কয়েকদিনের জেহাদের মধ্যেই বেশ কিছু লোককে ইসলামায়িত করতে সমর্থ হন। ফরাজীরা দীর্ঘ সময় ধরে পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সমান্তরাল সরকার চালাতো। তাদের আদেশ অমান্য করার সাহস কারুর ছিল না। তারাও ছলে বলে ও কৌশলে বহু লোককে গোমাংস খাওয়ায়।

রফিউদ্দিন আহমদ[৩.২৮] খুব গর্বের সঙ্গেই মুন্সী মেহেরুল্লার কথা বলেছেন। যশোর ঝিনেদার মুন্সী মেহেরুল্লা মাঠের মধ্যে বড় বড় দ্বীন সভা (ওয়াজ) ডাকতেন। এই সমস্ত ওয়াজে দু-চারজন হিন্দু শ্রোতা স্বাভাবিক ভাবেই জুটে যেত। বক্তৃতার জোরে তাদের কাছে হিন্দুধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করে সভার মধ্যেই কলেমা উচ্চারণ করানো হতো। মেহেরুল্লা হিন্দুধর্মকে হেয় করে বইও লিখেছিলেন। এইভাবে ছলে-বলে-কৌশলে ধর্মান্তরিত হয়েছিল অসংখ্য নিম্নবর্ণের হিন্দু। কোনও তত্ত্ব মেনে নয়।

তবে সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে। শ্রীহট্টের মওলানা সিদ্দিক আলী আদতে ছিলেন কায়স্থ সন্তান। তাঁর অভিভাবক কাকার মৃত্যুর পর তত্ত্ব জিজ্ঞাসার্থ এগারো বছর ধরে গ্রাম্য টোলে হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা করেন। কিন্তু এত কিছু পড়ার পরেও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ চিন্তা হয়। ফলে তিনি টোল ছেড়ে দেন এবং এক ফকিরের সংস্পর্শে এসে ইসলামে দীক্ষিত হন। সিদ্দিক আলী তাঁর পুঁথিতে লিখেছেন:

হিন্দু মৈলে সর্গে জাইতে নাই কুন পথ।
রাম কৃষ্ণ ব্রহ্মা বিষ্ণু নামরূদের মত॥
হিন্দু মৈলে নাহি জানি কি হবে উপায়।
ছাড়িলাম জাতিকুল জেকরে খোদায়॥
জাতি গুষ্টি থাকুক সব হইয়া বেইমান।[৩.২৯]

(নামরূদ = বিশ্বাসের শত্রু)।

পরে তিনি অবশ্য অনুভব করেন, বঙ্গীয় মুসলমানরা হিন্দুদের মতই পৌত্তলিক।

রফিউদ্দিন আহমদ লিখেছেন: এই ধরনের উদাহরণ খুবই অল্প। প্রাপ্তব্য তথ্য বলে বৃটিশপূর্ব যুগের ইসলামায়ন প্রায়ই দলে দলে—সম্ভবতঃ হৃদয়ের পরিবর্তনের কোনও পথে নয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইসলামায়নের পর ইসলাম শিক্ষা দেওয়াটা অত্যাবশ্যক। কারণ,

নব্য মুসলমানগণ ইসলামের অ আ ক খ কিছুই জানেনা। কিন্তু এ ধরণের শরিয়ৎ শিক্ষা দেওয়া হতো না। ফলে নব্য মুসলমানগণ অমুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতো এবং এমনকি তাদের অমুসলমান স্ত্রীও থাকতো।

যে ভাবেই ইসলামায়িত হোক না কেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই নব্য মুসলমানদের রূপ কীরকম ছিল?

চেহারায় ও বেশভূষায় তারা প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে মোটেই পৃথক ছিল না। খাটো ধুতি ও কাঁধে গামছা, এই ছিল সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের পোষাক। দাড়ি রাখা বা না-রাখার বাছবিচার ছিল না। নামও ছিল হিন্দু ঘেঁসা। নেপাল, গোপাল, নারায়ণ, গোবর্ধন, মদন, প্রতাপ, প্রভাত ইত্যাদি হিন্দু নাম ছাড়াও ছিল আধা মুসলমান, দায়েম, কায়েম, সাজন, দানেশ, শেহেজান, শিহান, মধু ইত্যাদি নাম। মেয়েদের নাম হতো, বাতাসী, কালী, কাত্যায়নী, লক্ষ্মী, কুঁড়ানী, পাঁচী, শারী, শোভানী ইত্যাদি। সামাজিকভাবেও সম সময়ের মুসলমানরা হিন্দুদের মত বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ছিল। জেমস ওয়াইজ[৩.৩০] কালোয়ার কলু, কুম্ভকার, কুটি, মাহিফরোজা, রফুগর, রংরেজ, তাঁতি, বাজনীয়া, হাজাম ইত্যাদি বিভিন্ন পেশাভিত্তিক জাতির কথা বলেছেন যারা বিবাহ সম্পর্ক নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখতো। প্রাথমিক ভাবে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ চারটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলঃ আশ্রফ, আতরাফ, আজলফ, আরজল। সাধারণ মানুষদের মধ্যে এই শ্রেণীভেদ প্রধানতঃ খানদান বা রক্তধারা দিয়েই ন্যস্ত ছিল। বিদেশাগত মুসলমানরা যেমন আশ্রফ শ্রেণীভক্ত ছিলেন, তেমনই ইসলামায়িত ব্রাহ্মণরাও আশ্রফ বলে চিহ্নিত হতেন। বাকী নব্য মুসলমানরা তাদের পূর্বতন সমাজ বা পেশা অনুযায়ী আতরাফ, আজলফ ও আরজলে বিভক্ত হতেন। আশ্রফ মুসলমানরা বাকীদের শৃগাল কুকুরের অধম বলেই মনে করতেন।[৩.৩১] এই সমাজে আশ্রফদের পরেই ছিলেন আতরাফ—কৃষকরা ছিলেন এই দ্বিতীয় স্তরভুক্ত।

আর দ্বীন বিশ্বাস? তারা নমাজ পড়তো ঠিকই—একটিও আরবী শব্দের অর্থ না জেনে। তাদের বাকী সংস্কৃতিটি ছিল পীর ফকিরের সংস্কৃতি—যা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, এমনকি দুয়ের সঠিক মিশ্রণ, তাও নয়—তা বাংলার চিরন্তন লোক সংস্কৃতি।[৩.৩২] উপরিলিখিত পীর ফকিরের বৈশিষ্ট থেকেই এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এছাড়া সাহিত্য যখন সমাজের দর্পণ, তবে সেই আমলের সাহিত্যের খোঁজ করা যাক।

প্রথমেই ফিরে আসা যাক সিদ্দিক আলীর পুঁথিতে। পূর্বলিখিত সিদ্দিক আলীর পুঁথি উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লেখা। সে আমলের গ্রাম্য মুসলমানদের আরাধনা ও উপাসনা সম্বন্ধে সিদ্দিক আলী লিখেছেন:

> খাড়া চন্ডি খাড়া বিবি বসন্ত রায়র পূজা।
> বিবি ঘটক ছাত্তাল পির সিতলির রাজা।
> কাঁচাখাওরি ঘাটকা পির আবিলের বলি।
> টাটা পিরের আটা গুড়া মঙ্গল চন্ডির থলি।
> সত্যপীর একাচরা আলো কাঁটার রাজা।
> সনির ভোগ আহ্বান পির কাল ভৈরবীর পূজা।
> নাটাই মানিক পির দামান্দের তেলাই।

বিসহরি নাগপূজা কালি চন্ডি মাই
কালিঘাটে সাহা চড়ক তরপে কোতব
পাঁচপির রক্ষা করে গরু বাছুর সব
আলিনগরের লক্ষা বিবি মুখে দিতে ভাত
সিলেটের সাহা জালাল সকলেরই গতি
কান্দা কাটা জারি মুরছা হায়ৎ ২ করে।।
হাছেন হোছেন মারা গেল কোথা কারে।।
পিরের সিরনি না করিলে গরু বাছুর মরে।।[৩.৩৩]

পরম সমন্বয়ের মধ্যে বাস করতো সেই সময়কার হিন্দু মুসলমান। ঐহিক কারণে তাদের মধ্যে বিবাদ লাগলেও পারত্রিক কারণে তাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না। এই সময়কার সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফৈজুল্লার পুঁথি। ফৈজুল্লা হাওড়া জেলার পাঁচলা গ্রামের মানুষ। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সত্যপীরের পাঁচালী লিখেছিলেন। পাঁচালীর আরম্ভে তিনি লিখেছিলেন নিম্নলিখিত বন্দনা:

সেলাম করিব আগে পীর নিরাঞ্জন
মহম্মদ মস্তফা বন্দো আর পঞ্জাতন।
সের আলী ফতেমা বন্দো একিদা করিয়া
হাচেন পৈয়দা হেল যাহার লাগিয়া।
রছুলের চারি ইয়ার বন্দো শত শত
চারিদহ ইমামের নাম লব কত।
এবরাহিম খলিলের পায়ে করি নিবেদন
বেটারে করবাণি দিল দীনের কারণ।
করবানি করিয়া দিল এসমাল করিয়া
সেই হইতে নিকে বিভা হইল দুনিয়া
আম্বিয়ার হাসিল বন্দো পালোয়ান দুইজনে
এসমাইল গাজি বন্দো গড় মান্দারণে।
বন্দিব জেন্দা পীর কামাএর কনি
বড় খান মুরিদ মিঞা করিল আপনি।
পান্ডুয়ার সফি খায়ে করি নিবেদন
অবশেষে বন্দিব সত্যপীরের বরণ।
সম্বল জাহানে বন্দিব পীর আছে যত
বিবি ফতেমার কদমে বন্দিব শত শত।
হিন্দুর ঠাকুরগণে করি প্রণিপাত
খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ।
নামেতে বন্দিয়া গাইব ধর্ম নিরাঞ্জন
যার ধবল ঘাট ধবল পাঠ ধবল সিংহাসন।
যমুনার তটে বন্দো রাস বৃন্দাবন
কৃষ্ণ বলরাম বন্দো শ্রীনন্দের নন্দন।

নবদ্বীপের ঠাকুর বন্দো চৈতন্য গোসাঞি
শচীর উদরে জন্ম বৈষ্ণব গোসাঞি।
কামার হাটির পঞ্চাননে করি নিবেদন
দশরথের পুত্র বন্দো শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী
সীতা ঠাকুরানী বন্দো আর যত সতী।
দৈবকী রোহিনী বন্দো শচী ঠাকুরানী
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিল আপনি।
শুনহ ভকত লোক হএ একচিত
সত্যপীর সাহেব সবায় করে হিত।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ
গুণগাহী আপনি আসরে দেহ মন।
ভকত না একের তরে মোকেদ হইয়া
আসিয়া দেকহ্ পীর আসরে বসিয়া
ছাড় গাজি মক্কার স্থান আসরে দেহ মন
গাইল ফৈজল্লা কবি সত্য পদে মন॥[৩.৩৪]

মৈনুদ্দিন আহমদ খান উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমানদের ইসলামী সংস্কৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন:[৩.৩৫]

ভারত পাক মহাদেশের ইসলাম মূলতঃ সূফীদের দান। এই সুফীরা শরিয়ৎ অপেক্ষা ঈশ্বর প্রেমের দিকেই বেশী গুরুত্ব দিতেন এবং স্থানীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতেন। ফলে উলেমাদের থেকে তাঁরা অনেক বেশী গ্রহণীয় ছিলেন জনসাধারণের কাছে। সুফীরা আবার সালিক ও মজুব দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। সালিকেরা সুফী হলেও শরিয়তে পুরো বিশ্বাসী। মজুবেরা শরিয়তে ততো আস্থাশীল ছিলেন না। কিন্তু মজুব বা বেশরা ফকিররাই ছিলেন সবচেয়ে আদৃত। কারণ, তাঁরা আলা-ভোলা মানুষ। পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন এবং যা পেতেন তাই খেতেন। তাঁরাই ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। মানুষ তাঁদের মধ্যেই ঈশ্বরকে খুঁজে পেত। এইসব বেশরা ফকিররাই বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বহু হিন্দুকে মুরিদ বানান।

বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল নানারকম লৌকিক আচার। জন্মাষ্টমীর মতই উদযাপিত হতো নবীর জন্মদিন। হিন্দুদের শ্রাদ্ধের মতই ছিল পীরের মৃত্যু দিন উপলক্ষ্যে উরস। বিষ্ণুপাদপদ্মের মতই পূজ্য ছিল নবীর পায়ের ছাপ, কদম রসুল। চট্টগ্রামের কদম রসুল মসজিদ আজও আছে। গৌড়ের একটি সৌধে আছে পাথরের কদম রসুল। ভাদ্রমাসের বৃহস্পতিবারের বেরা ভাসান উৎসব আসলে খোয়াজ খীরের উপাসনা। হিন্দু মুসলমানের মিলিত উৎসব বেরা ভাসানে মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলাও যোগ দিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব প্রাসাদে দেওয়ালীও উদযাপিত হতো। দেওয়ালী লঙ্কা বিজয়ের পর রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের উৎসব। এছাড়া নবী কন্যা ফতিমাও বিবি ফতিমা রূপে পূজিতা হতেন বঙ্গদেশে। কারবালা যুদ্ধের মহরম ও হাসান হোসেনের প্রাণদানের কাহিনী প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল বঙ্গের জনমানসে। মীর মশারফ হোসেন লিখেছেন বিষাদ সিন্ধু। বেগম রোকেয়াও লিখেছেন হাসান হোসেনের

কাহিনী। হাসান হোসেন ও অন্যান্য ইমামরা নবী ও তাঁর খলিফাদের থেকে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন মুসলিম জনমানসে, বিশেষতঃ মহিলাদের মধ্যে।

বলা বাহুল্য, মানুষের সহজাত এইসব প্রবৃত্তি শরিয়ৎ বিরোধী, কিন্তু রক্তগত হিন্দু চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই সময়কার গ্রামীন সমাজে যাত্রা এবং বারোয়ারী পূজার মত আমোদ প্রমোদ হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রে সমভাবে উপভোগ করতো। মুসলমানরা হিন্দুদের মত সমভাবে চাঁদাও দিত এসব ব্যাপারে। যদিও হিন্দুরাই ছিল এসমস্ত উৎসবের সংগঠক। মূর্ত্তিপূজা এবং হিন্দুপুরাণের বিষয়বস্তু নিয়ে পৌরাণিক পালা ও কবিগান মুসলমানরাও উপভোগ করতো। এছাড়া ছিল মুসলমানদের গাজীরামের গান এবং হিন্দুদের কীর্তনের দল। এইভাবে গ্রাম বাংলার কৃষক ও অন্যান্য পেশার মানুষদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মেল বন্ধন ছিল। পরম শান্তি ও সৌভ্রাত্রের মধ্যে বাস করতো দুটি সম্প্রদায়।

এই ধরণের হিন্দু মুসলমান সমন্বয় সম্বলিত বাঙ্গালী সমাজের পটভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিল মূর্ত্তিমান বিচ্ছিন্নতাবাদ—তিতুমীরের শরিয়তী আন্দোলন, 'তরিকা-ই-মহম্মদীয়া'। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে তিতুমীরের শরিয়তী আন্দোলন ও রক্তক্ষয়ী জেহাদের কথা।

৪ / নারকেলবেড়িয়ার জঙ্গ

তিতুমীরের আসল নাম মীর নিসার আলী। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তদানীন্তন বারাসত জেলার হায়দরপুর গ্রামে এক সম্পন্ন কৃষক পরিবারে জন্ম তিতুমীরের। ওই হায়দরপুর বর্তমানে বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানাধীন। তিতুমীরের পিতার নাম মীর হাসান আলী, মাতা আবেদা রোকেয়া। তিতু ছাড়াও হাসান আলীর আরও একটি পুত্র ও দুটি কন্যা ছিল; মীর নিহাল আলী, হামিদা ও হাসিনা খাতুন।

বাল্যকালে তিতু প্রায়ই জ্বরে ভুগতেন। জ্বর মুক্তির জন্য তাঁকে শিউলী পাতা বা ওই ধরনের তিক্ত ভেষজ-উদ্ভিদ খাওয়ানো হতো। বালক তিতু অনায়াসে গ্রহণ করতো ওইসব অতৃপ্তিকর ভেষজ। সেজন্য পিতামহী জয়নাব খাতুন আদরের পৌত্রের নাম দিয়েছিলেন, তিতা মিঞা।

শৈশবে গ্রামের মাদ্রাসায় তিতুর বিদ্যাচর্চার শুরু। সেই সঙ্গে শুরু মাদ্রাসা সংলগ্ন আখড়াতে শরীর চর্চাও। তার ফলে একদিকে তিতু যেমন আরবী, ফার্সী, বাংলা, উর্দু ইত্যাদি ভাষা ও অঙ্কে দক্ষ হয়ে উঠলেন, অন্যদিকে আখড়ায় লাঠি-সড়কী চালনা ও কুস্তি শিখে তেমনই সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠলেন ওইসব শরীরী বিদ্যায়। যুবা বয়সে তাঁর তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের দেহ হয়ে উঠলো বলিষ্ঠ ও সুসন্নদ্ধ। যদিও তাঁর উচ্চতা ছিল সে তুলনায় কিছু কমই। তিতুমীরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার লিখেছেন "সে দেহ ধর্মভাবদ্যোতক নহে, বীরত্ব-বীর্য ব্যঞ্জক।" আপন দ্বীন ও সম্প্রদায়ের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি ছিল তিতুর। ইংরেজ শক্তির নিকট সাম্রাজ্য হারাণোর বেদনা অন্যান্য সচেতন মুসলমানের মত তিতুর হৃদয়েও বেদনার সুর বাজাতো।

এ সবই গল্প কথা। অবলম্বন বিহারীলাল[৪.১] ও আবদুল গফুর সিদ্দিকীর গ্রন্থ[৪.২] দুটি গ্রন্থেরই ঐতিহাসিক সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখেছেন বিদগ্ধজনেরা।[৪.৩] তবে বসিরহাট অঞ্চলের এক অখ্যাত মুসলমান সন্তানের কৈশোর ও যৌবনের বিশ্বস্ত কাহিনী সমকালীন কোন লেখকই বা লিপিবদ্ধ করে রাখবেন?

এরপর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তিতুমীরকে দেখা যায় কলকাতায়; পেশাদার কুস্তিগীর রূপে। পালোয়ান হিসাবে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেন তিনি। কিন্তু এই সুনামী কুস্তিগীর পরবর্তী কালে কি আকাঙ্ক্ষায় যে নদীয়ার এক হিন্দু জমিদারের অধীনে লাঠিয়ালদের সর্দারী করতে গিয়েছিলেন, তা জানা যায় না। শুধু জানা যায়, এক লাঠালাঠির ঘটনায় তিনি গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে কারাদন্ড ভোগ করেন।[৪.৪] কারাবাসের মেয়াদ যশোহর জেলে উত্তীর্ণ করে তিনি যখন কলকাতায় এসে পৌঁছলেন তখন স্যায়িদ আহমদ বেরিলবী কলকাতায় এসে গেছেন হজ্জ যাত্রার পথে। তিতু বেরিলবীর কাছে বা' আত বা দীক্ষা গ্রহণ করে সামিল হলেন 'তরিকা-ই-মহম্মদীয়া' আন্দোলনে। তারপর হজ করতে গেলেন বেরিলবীর সঙ্গেই।

তিতুমীর সংক্রান্ত রচনাবলীতে দেখা যায়, তিতুকে হজ করতে পাঠানো হয়েছে দিল্লীর এক রাজ পরিবারের সঙ্গে। এ ধারণার উৎপত্তি সম্ভবতঃ তিতুর বিদ্রোহ দমনের অব্যবহিত পরে, ২[illegible]শে নভেম্বরে, সার্কিট কমিশনার বারওয়েলকে লেখা বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট

ডব্লিউ, এস. আলেকজান্ডারের এক প্রতিবেদন থেকে।[৪.৫] আবদুল গফুর সিদ্দিকীর মতে দিল্লীর রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিটি হলেন কলকাতার মির্জাপুরের জমিদার মির্জা গোলাম আম্বিয়া। বেরিলবীর দলের সঙ্গে হজ করার ব্যাপারে হয় মির্জা সাহেব নিজেই তিতুকে অর্থ জুগিয়েছিলেন, অথবা, তাঁরই সুপারিশে বেরিলবী মুফতে তিতুকে হজ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমানে বেরিলবীর হজযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়।[৪.৬] তাতে দ্বিতীয় কোনও ভারতীয় হজযাত্রীদলের সঙ্গে বেরিলবীর দলের সাক্ষাতের সংবাদ নেই। থাকলে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতো তার তাৎপর্য। কারণ, আগেই বলা হয়েছে ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম হজযাত্রা ভারতবর্ষে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বেরিলবীই হজযাত্রার পুণঃ প্রচলন করেন। বেরিলবীর অনুসরণকারী দ্বিতীয় একটি দল (কাফেলা) সম্বন্ধে জীবনীকাররা নীরব থাকতে পারেন না।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে জেলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনে পালনীয় আচার অনুষ্ঠানই হজ। সে অনুষ্ঠান তিতুমীর এবং বেরিলবী অবশ্যই একসঙ্গে পালন করে থাকবেন। সুতরাং সবদিক বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় মক্কায় বেরিলবীর সঙ্গে তিতুর আলাদাভাবে সাক্ষাতের কথা অবাস্তব। তিতু বেরিলবীর সঙ্গেই হজে গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিতুর জেহাদের অব্যবহিত পরে ২৫.১১.১৮৩১ তারিখে ইন্ডিয়া গেজেট লিখেছিল, তিতু বেরিলবীর সঙ্গেই হজে গিয়েছিলেন।[৪.৭]

বেরিলবী হজ সমাপ্ত করে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিতু যে কী করেছিলেন তা জানা যায় না। বেরিলবী স্বগৃহে কিছুকাল বসবাস করার পরে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের সতেরই জানুয়ারী জেহাদের উদ্দেশ্যে হিজরৎ করার জন্য উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দিকে রওনা হন।[৪.৮] ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের কোনও এক সময়ে বেরিলবী উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে 'কাজ' করার জন্য কয়েকজন মুজাহিদকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠান। সেই অনুযায়ী বঙ্গদেশে 'কাজ' করার জন্য পাঠান পাটনার এনায়েৎ আলীকে। তিতুমীর বেরিলবীর সঙ্গে হিজরৎ করেছিলেন কিনা, বা করলেও বেরিলবী তাকে কাজ করার জন্য দেশে পাঠিয়েছিলেন কিনা, এ বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে একটা ব্যাপার স্মরণ রাখা দরকার: তিতু বেরিলবীর শিষ্য হলেও মুখ্য শিষ্য নন—অন্ততঃ বেলায়েৎ আলী বা এনায়েৎ আলীর স্তরের কেউ নন। সেজন্য ইংরেজীতে লেখা বেরিলবীর জীবনীগুলিতে তিতুকে পাওয়া যায় না। তবে, কেয়ামুদ্দিন আহমদ 'তারিখ-ই-আহমদী' বলে একটি পুঁথির উল্লেখ করেছেন, তাতে নাকি নিশার আলীর কথা আছে।[৪.৯]

এছাড়া মনে রাখতে হবে দার-উল-হরবে মুসলমানদের জেহাদী আন্দোলন গোপনেই সংগঠিত হয়। তরিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলনের সমসাময়িক শরিয়তী আন্দোলন 'ফরাজী' সম্পর্কে ফরিদপুর-মাদারীপুরের তৎকালীন মহকুমা শাসক নবীন চন্দ্র সেন লেখেন, ফরাজী নেতারা যেন আয়নার ছবি, ধরিবার জো নাই, ধরিবে কী, তাহাদের নাম পর্যন্ত কেউ প্রাণান্তে প্রকাশ করিবে না।[৪.১০]

স্যায়িদ আহমদ বেরিলবীর তরিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলন, যা ইতিহাসে ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত, তার কথা জনসাধারণ জানতে পারে মাত্র ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের শেষে[৪.১১]। অথচ এই জেহাদী আন্দোলনের সুরু ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। মেটকাফ প্রভৃতি কিছু

কিছু উচ্চস্তরের রাজকর্মচারী অবশ্য কিছু সংবাদ জানতেন। মেটকাফ ছিলেন শাহ্ ওয়ালি উল্লা-পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজের ভক্ত।[৪.১২] কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বৃটীশ সরকার যথেষ্ট অজ্ঞ ছিলেন ওয়াহাবীদের সম্বন্ধে।

যাইহোক, হাজী তিতুমীরকে কলকাতায় দেখা যায় ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে। ওই বছরে যশোহরের মোক্তার ফৈদ-অল-দ্বীনের সঙ্গে কলকাতায় তিতুর আলাপ হয়।[৪.১৩] ফৈদ অল-দ্বীন তিতুর অনুরক্ত ও সমর্থক হয়ে ওঠেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে তিতু ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে দেশে তরিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলনের কাজ শুরু করেন। বেলায়েৎ ও এনায়েৎ আলী যা করতেন তা হলো জেহাদের রসদ এবং সৈনিক বা মুজাহিদ সংগ্রহ। কারণ বেরিলবীর দীক্ষাটাই ছিল জেহাদের দীক্ষা। কেউ অন্য কিছু বলার চেষ্টা করলে বেরিলবী তাকে কঠোর শাস্তি দিতেন। সরকারী কাগজপত্রে উল্লেখ আছে বিদ্রোহের বছর তিনেক আগে থেকেই তিতু তাঁর স্বগ্রাম হায়দরপুরে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ওই সময়ে তাঁর বয়স ছিল বছর পঁয়তাল্লিশের মত।

নিম্নবর্গের ইতিহাস খ্যাত রণজিৎ গুহ অভিযোগ করে লিখেছেন, কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস যখন কোনও লেখক লেখেন তখন অবচেতন ভাবে হলেও লেখক তাঁর শ্রেণী চেতনা দিয়েই বিদ্রোহটিকে দেখেন। ফলে কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস যথার্থ হয় না। বিদ্রোহের মূল চরিত্র কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস।[৪.১৪]

আমরা মধ্যবিত্ত হিন্দুসন্তান। পেশায় শিক্ষাজীবি। একশো ষাট বছরেরও বেশী প্রাচীন বিদ্রোহের নায়ক তিতুমীরের চৈতন্য আমরা পাবো কী করে? তাই সেই অতীত ঘটনাকে নিজস্ব শিক্ষা-দীক্ষা-তত্ত্ব, তথ্য ও ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যা করার এই প্রচেষ্টা। তবে, তিতুমীরের সহযোদ্ধা, নারকেল বেড়িয়ার জেহাদের একজন স্রষ্টা ও দ্রষ্টা, সাজন গাজীর 'গান' আছে। আমরা সেই সাজন গাজীর গানকে যথাসাধ্য ব্যবহার করেছি তিতুমীরের ইতিহাসের সন্ধানে।

·

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ় যে তিতুমীর হায়দরপুর গ্রামে এসে পৌঁছলেন তাঁর পূর্ব-স্মৃতি কী? কী তাঁর উপলব্ধি?

আগেই আমরা জেনেছি তিতুমীর এক সম্পন্ন কৃষকের সন্তান। তিনি নিজহাতে কোনও দিন আবাদ করেননি। করেছেন মস্তিষ্ক ও শরীরের চর্চা। পড়েছেন মক্তবে-মাদ্রাসায়, শিখেছেন শারীরিক কসরৎ। তারপর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন স্যায়িদ আহমদ বেরিলবীর মত একজন ইসলামী তত্ত্ববিদের। হজ করেছেন তাঁরই সঙ্গে।

তিতুর মত একজন আশ্রফ মুসলমান সন্তান বাল্যকালে কী শেখে? জানা নেই। সুতরাং শরণাপন্ন হওয়া যাক গত শতাব্দীর বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ টমাস পাট্রিক হিউয়েজের:

"যত শীঘ্র সম্ভব শিশুকে কলেমা উচ্চারণ করতে শেখানো হয়। এরপর তাকে শেখানো হয় ইসলামের নানা গৌরব গাঁথা। সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণা করতে শেখানো হয় অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কে। এরপরে মক্তবে মাদ্রাসায় আরবী বর্ণপরিচয়—শ্লেটে লিখে লিখে শেখান মৌলভীরা। বর্ণপরিচয়ের পর শেখানো হয় আল্লাহর নিরানব্বইটা নাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছোটখাটো আরবী পদও। তারপর শেখানো হয় কোরাণের প্রথম অধ্যায়টা পড়তে ও লিখতে। পরে গোটা কোরাণটা—একটা লাইনও না বুঝেই। কোরাণ লেখার পর কিছু কিছু ব্যাকরণ

ও অঙ্ক। এরপর হিন্দুস্থানী বা ফার্সী ভাষায় কিছুটা দক্ষতা। গুলিস্তান এবং বোস্তান উভয়ই পড়তে পারলে ধরে নেওয়া হয় ফার্সী ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা জন্মেছে।[৪.১৫]

তিতুমীর বাল্য বয়সে এই ধরনের শিক্ষালাভ করেছেন বলেই ধরে নিতে হবে। এরপর স্যায়িদ আহমদ বেরিলবীর কাছে শিক্ষা। সে শিক্ষা উদার হানাফী মতবাদের শিক্ষা নয়। কারণ, শাহ্ ওয়ালীউল্লা চারটি মজহাবকেই বিদায় জানিয়ে কোরাণ-হাদিশকেই ইসলামের একমাত্র তথ্যসূত্র মেনে ছিলেন। সুতরাং তিতুর শিক্ষা কোরাণ-হাদিশ ভিত্তিক শরিয়তী শিক্ষা। যার মধ্যে আছে ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ, দার-উল-ইসলাম, দার-উল-হরব এবং অবশ্যই জেহাদ।

সেই শিক্ষা নিয়ে মধ্য বয়সী তিতু হায়দরপুরে এসে জেহাদের রসদ এবং জেহাদী সংগ্রহ করতে এসে কী দেখলেন?

দেখলেন গ্রামের মোমিনদের (মুসলমানদের) বাহ্যভাবে বা মানসিকভাবে পৃথক করা যাচ্ছে না প্রতিবেশী মুশরিক (পৌত্তলিক) কাফেরদের থেকে।

মুসলমান ইতিহাস লেখকরা ব্যাপারটিকে মুসলমান সমাজে হিন্দুয়ানীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে বর্ণনা করেছেন। বেশ কিছু হিন্দুসন্তান ইতিহাস লেখকেরাও সেই বক্তব্য মেনে নিয়েছেন। স্বপন বসু বিহারীলালের গ্রন্থের সম্পাদনা করতে গিয়ে লিখেছেন, তিতুমীরের সমকালে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে হিন্দুয়ানীর ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে।[৪.১৬]

প্রশ্ন হচ্ছে, কে কার মধ্যে প্রবেশ করেছে? হিন্দুয়ানীর মধ্যে মুসলমানীর না, মুসলমানীর মধ্যে হিন্দুয়ানী? বঙ্গদেশ আগে হিন্দু অধ্যুসিত ছিল? না, মুসলমান অধ্যুসিত ছিল?

জবাবটা স্বপন বসু নিজেই দিয়েছেন, ঠিক তার পরের লাইনে। "অনেক নও মুসলমান দুর্বলতা ও অশিক্ষার কারণে পূর্বের দেবদেবীর পুজায় ও কুসংস্কার পালনে অভ্যস্ত থাকে।"

গৃহস্থের বাড়ীতে চোর ঢুকলে গৃহস্থের অনুপ্রবেশ হয় না। চোরেরই অনুপ্রবেশ হয়। হিন্দুসমাজে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ইসলামেরই।

অমলেন্দু দে ও লেখেন, "সম্ভবতঃ তিতুমীর মনে করেন, বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে।[৪.১৭]

যেন, আগে বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান খুব সবল ছিল। আবার এই অমলেন্দু দে-ই পরের লাইনে লেখেন, "তারা এখনও পাকা মুসলমান হতে পারেন নি।"

স্বপন বসু ও অমলেন্দু দে'র স্ববিরোধীতা লক্ষনীয়। কারণ তাঁরা ভারতবিদ্বেষী ইতিহাস লেখকদের ব্যবহৃত হিন্দুয়ানীর অনুপ্রবেশ কথাটি বিনা বিচারেই ব্যবহার করেছেন।

সুতরাং তিতুমীর বৃটীশ বিরোধী জেহাদের মানসিকতা নিয়ে গ্রামে এসে প্রথমে আধা মুসলমানদের পাকা মুসলমান করার প্রচেষ্টায় রত হলেন। এ প্রচেষ্টায় তাঁর অস্ত্র হলো শরিয়তের যাবতীয় শিক্ষা। সাজন গাজীর গানে আছে, তিতুমীর

নামাজ রোজা শেখাইত রাখতে বলতে দাড়ি।
দিনের তারিখ শেখায়ে ফেরে বাড়ী বাড়ী॥
পাপ গোনা বদকাম তাও করে মানা।
বাংলায় জারি করে আরবের কারখানা॥[৪.১৮]

[দিনের তারিখ = ইসলামের ইতিহাস, গোনা = গুনাহ, দোষ]

আসলে 'তরিকা-ই-মহম্মদীয়া' কোনও পুণরুজ্জীবন আন্দোলন নয়, পূর্ণ ইসলামায়ন আন্দোলন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে একটি মিশ্র সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি বিরাজ করতো। পূর্ব অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। হিন্দু মুসলমানের জীবনযাত্রার মধ্যে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও তারা মূলতঃ একটি জাতিগোষ্ঠীই ছিল—সে জাতির নাম বাঙ্গালী। ঐহিক কারণে দুজনের মধ্যে বিবাদ ঘটলেও উপাসনা-আরাধনার কারণে বিবাদ কদাচ ঘটতো না। কারণ, মূলতঃ মারিফতী ইসলামের সাহায্যে ইসলামায়িত নিম্নবর্গের গ্রাম্য মুসলমানদের মধ্যে জেহাদী তত্ত্ব প্রবেশলাভ করেনি। ফলতঃ তাদের আচার আচরণ ছিল সম্পূর্ণ মানবিক।

কিন্তু তিতুমীর এই আধা-ইসলামী মানবতাবাদী জনগোষ্ঠীকে ইসলামায়িত করতে গিয়ে বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বই প্রচার করলেন। এই আধা মুসলমানদের মানসিকতার পরিবর্তন করার জন্য তিনি যা প্রচার করলেন তা অবশ্যই 'তরিকা-ই-মহম্মদীয়া।' 'তরিকা-ই মহম্মদীয়া' সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

শুধু মানসিকভাবে নয়, বাহ্যিক ভাবেও তিতু মুসলমানদের তাদের পিতৃ-পিতামহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সচেষ্ট হলেন। আগেই আমরা জেনেছি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের পরিধেয় ছিল ধুতিই। তিতুমীর ফতোয়া জারী করলেন, কাছা দিয়ে কাপড় পরা চলবে না। গোঁফ ছাঁটতে হবে, দাড়ি রাখতে হবে, কামাতে হবে মাথার মাঝখানটা।

তখনকার দিনে গ্রাম্য মুসলমানদের নাম হিন্দু ধরণের হতো। এখনকার মত ওল্ড টেষ্টামেন্টের চরিত্রের আরবায়িত নাম বা আল্লাহর নিরানব্বইটি বিশেষণকে ভিত্তি করে আরবী নামকরণ হতো না। তিতুমীর ফতোয়া জারী করলেন, পুরোপুরি আরবী মুসলমানী নাম রাখতে হবে। তিনি পুরনো নাম পাল্টে নতুন নতুন আরবী নামও দিতে লাগলেন। এইভাবে সামগ্রিক ভাবেই তিনি এক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করলেন এবং এই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি শরিয়ৎ নির্দেশিত। বস্তুতঃ তিনি শরিয়ৎ নির্দেশিত এক জেহাদী মুসলমান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করতে চাইলেন, যে সম্প্রদায় চেহারায় কথাবার্তায়, আচার-আচরণে মুশরিক হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সরফরাজপুরে বর্গীর হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি কোঠা বাড়ীর ছাদ ফেলে দিয়ে নতুন করে উলুখড়ের ছাদ লাগিয়ে তিনি স্ব-সম্প্রদায়ের জন্য একটি মসজিদও নির্মাণ করলেন।

একটি দুটি করে অনেকেই তিতুর অনুগামী হতে লাগলো। তারা পালন করতে লাগলো তিতুর নির্দেশাবলী। বারাসতের গ্রামাঞ্চলে উদ্ভব হলো এক নতুন সম্প্রদায়ের। সে সম্প্রদায়ের মানুষেরা চেহারা আচার-আচরণে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দুদের থেকে পৃথক তো বটেই, সাবেকী মুসলমানদের থেকেও পৃথক। কারণ, সাবেকী মুসলমানরা হানাফী মজহাবের অন্তর্গত। আর 'তরিকা-ই-মহম্মদীয়া' শাহ্ ওয়ালীউল্লা সিলসিলার আন্দোলন। গ্রামের লোকেরা এই নতুন সম্প্রদায়ের লোকদের বলতে লাগলো 'মৌলভী'। মৌলভীরা সহমর্মিতা সৃষ্টির জন্য একসঙ্গে খাওয়া দাওয়াও করতে লাগলো। ঠিক আধুনিক কালের কমিউনবাসীদের মত। সেই আমলে মুসলমান প্রজারা হিন্দু জমিদার ও তালুকদারদের বাড়ীতে পূজা পার্বনে ভেট পাঠাতো। পরিবর্তে তাদের অনুষ্ঠানে পাতা পেতে খিচুড়ী ও প্রসাদ খেতো বিনা দ্বিধায়। তিতু এই ভেট পাঠানো ও হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানে খাওয়া, দুটোই বন্ধ করতে বললেন। কারণ শরিয়ৎ অনুযায়ী একজন মুসলমান 'কেতাবী' খৃষ্টান ও ইহুদীদের সঙ্গে একত্র আহার করতে পারে, কিন্তু পৌত্তলিকদের সঙ্গে আহার নিষিদ্ধ।

সব মিলিয়ে তিতুমীর গ্রাম বাংলার সম্প্রীতির বাতাবরণ বিষাক্ত করলেন। বিনষ্ট করলেন তৎকালীন ধর্ম-সামাজিক ভারসাম্য।

বহু শতাব্দী ব্যাপী তুর্কী শাসনের দুঃস্বপ্ন থেকে হিন্দুসমাজ তখন সবে জেগে উঠেছে। ইংরেজরা বিধর্মী হলেও মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী। সাম্রাজ্যের স্বার্থেই তারা হিন্দুর ধর্মাচরণে তেমন হস্তক্ষেপ করে না। সে আমলে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচার ছিল ঠিকই। ছিল তাতে সরকারী সমর্থনও। কিন্তু তারা অন্ততঃ গোমাংস খাইয়ে হিন্দুর জাত মারার জন্য ব্যগ্র ছিল না।

সুতরাং ব্যাপারটা মোটেই ভাল ঠেকলো না স্থানীয় জমিদারদের। তাঁরা আর এক ঔরঙ্গজেবের উদ্ভব আশংকায় শংকিত হয়ে উঠলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে জমিদার তালুকদারেরা তখন গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট শক্তিশালী। এখনকার রাজনৈতিক মদতপুষ্ট মাস্তানদের সঙ্গে অনায়াসে তাদের তুলনা করা যায়। সেই গ্রাম্য মাস্তানেরা দেখলেন তাদের স্বাদু জলের পুষ্করিণীতে কোথা থেকে বেনো জল ঢুকছে। এখনকার এক রঙের রাজনীতি অধ্যুষিত অঞ্চলে অন্যরঙের রাজনীতি অনুপ্রবেশ করলে যা হয়। তারা নতুন বিভেদপন্থীদের শায়েস্তা করার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। এদিকে সাবেকী মুসলমানরা, যাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া লোককান্ত সংস্কারগুলিকে ছাড়তে পারেননি, তাঁরা স্বভাবতই বিরক্ত হলেন তিতুর ওপর। তিতুর তলে তলে বৃটীশ বিরোধী মানসিকতাও তাঁরা পছন্দ করলেন না। কারণ, সমকালীন বিশ্বজয়ী ইংরেজের শক্তি সম্বন্ধে তাঁদের কিছু না কিছু ধারণা ছিল। সেই শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদের দ্বারা নিজেদের অবস্থানের ভারসাম্য নষ্ট করাও তাঁদের কাম্য ছিল না।

অন্যদিকে হাজী তিতুমীরের সুন্দর চেহারা ও বক্তৃতায় মোহিত হয়ে আশপাশের এলাকার বেশ কিছু মানুষ তিতুর দলে নাম লেখাতে লাগলেন। এছাড়া ওই অঞ্চলে বেরিলবীর কাছে বা' আত নেওয়া বহু মুসলমান ছিল। ফলে দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগলো তিতুর শক্তি।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মাঝামাঝি নাগাদ মৌলভীরা নিজেদের 'তরিকা' প্রচারের জন্য অত্যুৎসাহী হয়ে উঠলেন। হান্টার[৪.১৯] ও কেয়ামুদ্দিন আহমদ[৪.২০] এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে স্যায়িদ আহমদ বেরিলবীর পেশোয়ার বিজয়ের সংবাদই এই উৎসাহের মূলে—যা ওই সময় বঙ্গদেশে এসে পৌঁছয়। মৌলভীরা উৎসাহের চোটে সাবেকী মানসিকতার মুসলমানদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক ও ছোটখাটো মারামারির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন।

এই ধরনের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে তারাগনিয়াতে। ওই গ্রামের ষোলটি সাবেকী মুসলমান পরিবারের লোকজন মহরমের দিন স্থানীয় দরগাতে 'নজর' দিচ্ছিলেন। মৌলভীদের একজন, পূজত মল্লিক তাদের অনুষ্ঠানে বাধা দেয়, দরগায় লাথি মারে। কুড়গাছি আর নাগরপুরের মৌলভীরাও একই কান্ড করে। ফলে সাবেকী সম্প্রীতিবাদী মুসলমানরা এ ব্যাপারে নালিশ করে জমিদারদের কাছে।

জমিদারেরা স্বভাবতই 'ব্যবস্থা' নিতে শুরু করেন মৌলভীদের বিরুদ্ধে। তাঁদের নজর অবশ্যই পড়ে মৌলভীদের বিচিত্র ছাঁদের দাড়ির দিকে। ওই ধরনের দাড়ি 'বিদেশী'—সেই গ্রামীন পরিবেশে নিতান্তই বেমানান।

জমিদারেরা আদেশ দিলেন, পিতৃদত্ত নাম কেউ পাল্টাতে পারবে না, দাড়ি রাখতে পারবে না ইত্যাদি। সবচেয়ে অদ্ভুত কাজ করলেন পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়। তিনি মৌলভীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রতিজনের দাড়িতে আড়াই টাকা করে কর বসালেন। কারণ, ওই সময়ে দাড়ি রাখার রেওয়াজ ছিল না সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে। মৌলভীরাই শুধুমাত্র দাড়ি রাখতে আরম্ভ করেছিল। ব্যাপারটা প্রচন্ড আঘাত হানলো তিতুর মত মুসলমানদের শরিয়ৎ বিশ্বাসে।

দাড়ি রাখা ও গোঁফ ছাঁটা স্বয়ং হজরত মহম্মদের আদেশ। নবী বলেছিলেন, "বহু দেবতাবাদীদের বিরুদ্ধে কাজ করো, গোঁফ ছোট করে ছাঁটো এবং দাড়ি রাখো।"[৪.২১]

সহী মুস্লিমের ওই হাদিশের ইংরেজী অনুবাদক ডঃ ইসমাইল হামিদ সিদ্দিকী যুক্তি দেখিয়েছেন ইসলাম যেহেতু নতুন ভ্রাতৃ-সংঘের সৃষ্টি করেছে, সেই ভ্রাতৃসংঘের সদস্যদের সনাক্তকরণের জন্য গোঁফ ছাঁটতে ও দাড়ি রাখতে বলা হয়েছে। যাতে তাদের সহজেই অমুসলমানদের থেকে আলাদা করা যায়।

হজরত মহম্মদ নিজেও দাড়ি রাখতেন এবং গোঁফ কামাতেন। নবীর নিজস্ব আচার ও বাণী—এই দুই নিয়েই হাদিশ। ধুতি পরা সম্বন্ধে নবীর বক্তব্য নেই। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাই যেহেতু নবীর লক্ষ্য সেহেতু তিতু কাছা দিয়ে ধুতি পরারও বিরোধিতা করলেন। যাতে, একদৃষ্টিতে মোমিনদের আলাদা করে চেনা যায় মুশরিক কাফেরদের থেকে। সুতরাং অবাচীন জমিদারদের দাড়ির ওপর ন্যস্ত কর তিতুকে যৎপরোনাস্তি ক্ষিপ্ত করে তুললো। সাজন গাজির গানে আছে:

ফি দাড়ি জরিপানা আড়াই টাকা হয়।
সেইজন্য সরাঅওলা বড় খাপা হয়॥[৪.২২]

সুতরাং তিতু কর আদায়েই বাধা দিতে বললেন অনুগামীদের। বললেন, দাড়ি রাখা তাদের শরিয়তের ব্যাপার। হিন্দু জমিদারদের তাদের দ্বীনের ওপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

সুতরাং শুরু হলো রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। সরকারী নথিপত্র ও অন্যান্য সমসাময়িক প্রামাণ্য সূত্র থেকে ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা বিধৃত হলো নীচে:

সংঘর্ষের সূত্রপাত ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের শেষে। পুঁড়া গ্রামের দায়েম ও কায়েম কারিগর নামে দুই জোলাকে ডেকে দাড়ি-কর চাইলেন জমিদার কৃষ্ণদেব রায়। জমিদারের ভয়ে তারা সঙ্গে সঙ্গে এক টাকা করে দিয়ে দিল এবং বাকী দেড় টাকা পরে জমা দিল জমিদার কাছারীতে। সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে কৃষ্ণদেব রায় সরফরাজ পুরে তাঁর দাড়িকর সংগ্রহের অভিযান চালালেন। সংঘর্ষের সূত্রপাত সেখান থেকেই। সরফরাজপুরে বলাই জোলার বাড়ীতে জনা তিরিশ মৌলভী সমবেত হয়েছে। একসঙ্গে এতোজন মৌলভীকে পেয়ে জরিমানা আদায়ের জন্য বলাই জোলার বাড়ীতে পেয়াদা পাঠালেন কৃষ্ণদেব রায়। কিন্তু মৌলভীরা পেয়াদাদের যৎপরোনাস্তি প্রহার করে ফেরত পাঠালো। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে শ তিনেক লাঠিয়াল নিয়ে সরফরাজপুরে তেড়ে এলেন জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ও তাঁর কর্মচারী হরিনারায়ণ বসু। লুটপাট মারামারি কিছু হলো। জমিদারদের আদেশে হীর-উল্লা আগুন নিয়ে এলো; বেহার গাজী আর জান মহম্মদ মসজিদের খড়ের চালে ধরিয়ে দিল

আগুন। তারিখটা দোশরা আষাঢ় ১২৩৭ বঙ্গাব্দ। এই ঘটনার পর গা ঢাকা দিলেন কৃষ্ণদেব রায় ও হরিনারায়ণ বসু।

দায়েম কারিগর ও অন্যান্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে সমস্ত ঘটনার তদন্ত করতে এলেন বসিরহাট থানার দারোগা রামরাম চক্রবর্তী। রামরাম তদন্ত করতে এসে 'স্বাভাবিক' ভাবেই জমিদারদের পক্ষ নিলেন এবং বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো প্রতিবেদনে লিখলেন, তিতুর অনুগামীরাই জমিদারদের অসুবিধায় ফেলার জন্য নিজেদের মসজিদে আগুন দিয়েছে। আবার কৃষ্ণদেব রায় এবং হরিনারায়ণ বসু লুটপাট ও অগ্নি সংযোগের ঘটনার অভিযোগ থেকে মুক্ত হবার জন্য 'অনুপস্থিতির ওজর' দেখালেন।

মৌলভীরা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হলেন এ হেন প্রতিবেদনে। ১২ই আগষ্ট দায়েম কারিগর ও অন্যান্যদের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ সাক্ষীর জন্য আবেদন করা হলো বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারও সন্দিহান হলেন রামরামের প্রতিবেদনের সত্যতা সম্বন্ধে। ফলে, কয়েকজন নিরপেক্ষ সাক্ষীকে তলব করা হলো। সাক্ষীরা হলেন দানিশ গায়েন, সুন্দর বণিক, প্রাণ গাজী, লোচন ঘোষ ও সুনেস সর্দার। ১৯শে আগষ্ট থেকে শুরু হলো সাক্ষ্য নেওয়া। সাক্ষ্য থেকে যদিও বোঝা গেল মসজিদে আগুন লাগানো স্বয়ং জমিদারেরই কাজ। তবুও জমিদারেরও যেন কিছু বক্তব্য আছে। সুতরাং বিবাদ বিসম্বাদ এড়ানোর সহজপথ হিসাবে উভয় পক্ষকে শান্তি বজায় রাখার জন্য পঞ্চাশ টাকার একটি বন্ড সম্পাদন করতে বললেন বিচারক আলেকজান্ডার।

স্বভাবতই এ বিচারে খুশী হলেন না মৌলভীরা। ওদিকে দোসরা ডিসেম্বর মামলার রায় বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ পরায়ণ জমিদারেরা সপ্তম আইন প্রয়োগ করে খাজনা অনাদায়ের অজুহাতে কয়েদ করলো দুজন মৌলভীকে। সুতরাং মৌলভীরা গোটা ব্যাপারটা বিহিত করার জন্য কলকাতার বড় আদালতে আপীল করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কাদির বক্স রায়ের অনুলিপির জন্য আবেদন জানালেন এবং তা পাওয়ার পর গোলাম মাসুম ও অন্যান্যরা কলকাতায় চললেন গ্রামের মোক্তার মহম্মদ মাসুদের সঙ্গে। কিন্তু ওই সময় দুর্গাপূজার জন্য আদালত বন্ধ ছিল এবং ডিভিশনাল কমিশনার জেলা পরিদর্শনে বাখরগঞ্জ গিয়েছিলেন। ফলে মৌলভীরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দেশে ফেরেন সেপ্টেম্বরের শেষে।

এরপরেই ঘটে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং বৃটীশের বিরুদ্ধে তিতুর জেহাদ ঘোষণা। সমস্ত ইতিহাস লেখকরাই কলকাতায় তিতুদের আপীল করার সাময়িক ব্যর্থতাকেই এই রক্তক্ষয়ী জেহাদের কারণ দেখিয়েছেন।

কিন্তু এখন যদি প্রশ্ন রাখা যায়, দুর্গাপূজার ছুটি তো চিরতরে ছুটি নয়, কমিশনারের পরিভ্রমণ তো অগস্ত যাত্রা নয়। ছুটি পরেই তো আবার আপীল করার সুযোগ মিলতো। তবে তিতু এত মরিয়া হয়ে উঠলেন কেন? কেন তাঁর তর সইলো না? কেন তিনি সামিল হলেন আত্মঘাতী সংগ্রামে?

তর যে তাঁর সয়নি এ কথাও তো বলা যাবে না। কলকাতা থেকে ফেরার দিন থেকে 'অ্যাকশন' নেওয়ার দিনের ব্যবধান পাঁচ সপ্তাহেরও বেশী। ততোদিনে কি বড় আদালত খোলেনি? নরহরি কবিরাজ বলেছেন, তাঁদের বিশ্বাস হয়েছিল যে সরকার থেকে গরীব মানুষরা সুবিচার পাবে না। কিন্তু এ বিশ্বাস থাকলে তাঁরা কলকাতায় গেলেন কেন?

তাহলে আপীল করার সাময়িক ব্যর্থতাই ব্যাপক রক্তক্ষয়ের কারণ, এই সরল সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। সবাই বলেছেন তিতু নেহাৎ বুদ্ধিহীন অবিবেচক

ছিলেন না। বৃটীশ শাসকদের শক্তি সম্বন্ধেও তিতুর সম্যক ধারণা ছিল। তবে তিনি হঠাৎ নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন কেন? কেন তিনি বৃটীশ শাসন অবসান হয়েছে বলে ঘোষণা করবেন?

উত্তরে একটা ছোট্ট অথচ ভারতের ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রথমে বালাকোটের যুদ্ধে পাঞ্জাবীদের হাতে শহীদ হয়ে যান তিতুর মুর্শেদ স্যায়িদ আহমদ বেরিলবী। তখনকার দিনে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বালাকোট থেকে কলকাতায় এ শহীদত্বের খবর আসতে যথেষ্ট সময় লাগার কথা। তাহলেও ৪/৫ মাসের মধ্যে খবর চলে আসতেই পারে। এবং এসেও ছিল—১৮.১১.১৮৩১ তারিখের ইন্ডিয়া গেজেট লিখেছে, কয়েকমাস আগে আমরা স্যায়িদ আহমদের মৃত্যুর খবর পরিবেশন করেছি।[৪.২৩] গোলাম মাসুমরা কলকাতায় গিয়ে কি সে সংবাদ পেয়েছিলেন? পেতে পারেন, আবার নাও পেতে পারেন। ঠিক আছে, না পেলেও আপত্তি নেই। অন্য তথ্যের দিকে হাত বাড়ানো যাক। পাঞ্জাব থেকে কিছু ফকির ওই বছরই অক্টোবর মাসে তিতুর দলে যোগ দিয়েছিল। তার মধ্যে মিস্কিন শাহও ছিলেন।[৪.২৪] কেউ কেউ আবার বলেছেন মিস্কিন শাহ্ আগে থেকেই দলে ছিলেন, অন্যান্য পাঞ্জাবী ফকিরেরা পরে যোগ দেন।[৪.২৫] যাই হোক, মোট কথা কয়েকজন পাঞ্জাবী ফকির ওই সময় দলে যোগ দেন। রণজিৎ সিংহের রাজত্ব পাঞ্জাবের ফকিররা নিশ্চিত ভাবেই স্যায়িদ আহমদের মৃত্যুর খবর জানতেন। কারণ, বহুপূর্বেই সেই সংবাদ পেয়ে আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছিল পাঞ্জাব রাজধানী অমৃতসর। শাহ্ ওয়ালিউল্লার পৌত্র শাহ্ ইসমাইলের শহীদত্বের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করে দিল্লীতে মিষ্টান্ন বিতরণ করেছিল এক শ্রেণীর মুসলমান। ফকিরদের উৎস সম্বন্ধে ২৪.১১.১৮৩১ তারিখের সরকারী গেজেটে তো সরাসরি বলা হয়েছে, ওই ফকিররা স্যায়িদ আহমদের ছাউনী থেকেই এসেছিল।[৪.২৬] কেয়ামুদ্দিন আহমদ আরও ইংগীত করেছেন যে ওই ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে স্যায়িদ আহমদের মৃত্যুর পর বেলায়েৎ আলী স্বীয় ভ্রাতা এনায়েৎ আলীকে বঙ্গদেশে 'তরিকা' আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্য পাঠান।[৪.২৭] যদিও পাঞ্জাবী ফকিরদের দলে এনায়েৎ আলী ছিলেন কিনা বলা শক্ত। কিন্তু থাকার সম্ভবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জেহাদের পরে এ ধরণের ফকিরদের একজনকেও পাওয়া যায়নি। এরা শহীদ না হয়ে দাড়ি কামিয়ে পালিয়ে যায়; যদিও মিস্কিন শাহ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে এক মুখ্য ভূমিকা নেন। তিনি ছিলেন একজন সার্থক যাদুকর। তাঁর কেরামতিতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল গ্রামের তাবৎ মানুষ। ভূষণার নাবালক জমিদার মনোহর রায় মিস্কিনের কেরামতিতে মুগ্ধ হয়ে তিতুকে সমর্থন করতে শুরু করেন বলে কথিত আছে।[৪.২৮]

সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে তিতুমীর ওই সময় পাঞ্জাবী ফকিরদের মারফৎ (এবং অন্য ভাবে) স্যায়িদ আহমদ বেরিলবীর শহীদত্বের সংবাদ পেয়েছিলেন। পরমগুরুর শহীদ হওয়ার সংবাদে দু-দুবার জেহাদের শপথ নেওয়া একান্ত শিষ্য কি করবেন?

অবশ্যই গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। কারণ আল্লাহর বাণী:

"...বস্তুতঃ যে আল্লার পথে সংগ্রাম করে সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক, তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার প্রদান করবো।[৪.২৯]

আর বেরিল্‌বী তো বলেই ছিলেন, জেহাদে মৃত্যুবরণ একজন মুসলমানের কাছে এক গ্লাস ঠান্ডা সরবতের থেকে বেশী উপাদেয়।

যাইহোক, আবার তাকানো যাক সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দিকেঃ যে সংগ্রামে শহীদ হয়েছিলেন তিতু।

সেপ্টেম্বরের শেষে তিতুর অনুগামীরা কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর চট করে কিছু ঘটলো না। শুধু কিছু পাঞ্জাবী ফকির যোগ দিল দলেতে। তিতুর দল এবার সমবেত হলো নারকেলবেড়িয়ায় মৈজুদ্দিন বিশ্বাসের জমিতে। মৈজুদ্দিন বিশ্বাস অবস্থাপন্ন কৃষক। পঞ্চাশ বিঘার মত নিষ্কর জমির মালিক। গোলাম মাসুম অজস্র বাঁশ দিয়ে সেই জমিতে একটা বুরুজ বানালো। সেই বুরুজে অস্ত্রশস্ত্র এবার রসদ জমাতে লাগলো মৌলভীরা। তেইশে অক্টোবর রাতে মৈজুদ্দিনের জমিতে একটা বিরাট ওয়াজ বা জনসভা করে মৌলভীরা। সম্ভবতঃ সেই ওয়াজেই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন তিতু। জেহাদের প্রাথমিক লক্ষ্য অবশ্যই বৃটিশ শাসনের প্রতিভূ হিন্দু জমিদারগণ, যাদের আক্রমণে শরিয়ৎ বিপন্ন।

ওদিকে নীলকররাও গ্রামাঞ্চলের সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য নষ্টকারী নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভবে চিন্তিত। কারণ ব্যবসায়ী মাত্রই দোকান বা কারখানার পরিবেশ সর্বদা অনুকূলে রাখতে চায়। প্রতিকূল পরিবেশে সুষ্ঠভাবে ব্যবসা করা সম্ভব নয়।

২৩শে অক্টোবর থেকে ৬ই নভেম্বর, মোটামুটিভাবে বাঁশের কেল্লাতেই আবদ্ধ রইলো মৌলভীর দল। পরিকল্পনা আঁটতে লাগলো তাদের জেহাদের।

শিরহিন্দী-শাহ্ ওয়ালিউল্লা সিলসিলার তরিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলনের শরীক তিতুমীরের জানা ছিল গোজাতি সম্পর্কে হিন্দুদের দুর্বলতার কথা: প্রাণের বিনিময়েও হিন্দুরা গোহত্যা করতে রাজী নয়। সুতরাং গোহত্যা দিয়েই তিতু জেহাদ শুরু করতে মনস্থ করলেন। জমিদার ও নীলকরেরা বিপদের আশঙ্কায় তিতুমীরের হাবভাবের ওপর কড়া নজর রাখছিল। ২৮ অক্টোবর বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের কাছে এক প্রতিবেদনে বসিরহাটের দারোগা জানালেন, তিতুমীরের অনুরাগীরা কৃষ্ণদেবের জমিদারীতে গোহত্যা করতে যাচ্ছে।[৪.৩০] দারোগা এ ও জানালেন, ব্যাপারটা যাতে না ঘটে সেজন্য তিনি দুজন বরকন্দাজ পাঠিয়েছেন।

প্রথম ঘটনা ঘটলো ৬ই নভেম্বর। প্রায় ৫০০ জেহাদী নিয়ে পুঁড়ার বাজার আক্রমণ করলো গোলাম মাসুম—তিতুর সেনাপতি। মহেশ চন্দ্র ঘোষের একটা গরু ছিনিয়ে নিয়ে সেটি মন্দিরের সামনে কেটে গোরক্ত ছিটিয়ে দিল মন্দিরের গায়ে ও বিগ্রহে। গরুটিকে কেটে চারভাগ করে টাঙ্গিয়ে দিল বাজারের চার কোণে। লুট করলো লাখন দেব, মোহন সাহা, গোলক চন্দ্র সাহা, শম্ভুনাথ মুদ্দিতের দোকান ও বাড়ী। ব্রাহ্মণ গোকুল চন্দ্র ভট্টাচার্য যাচ্ছিলেন স্নান করতে। গোলাম মাসুমরা তাকে ধরে বিবস্ত্র করে দারুণ প্রহার করলো। ভয় দেখলো গোমাংস খাইয়ে তাকে মুসলমান করে দেওয়ারও। এক নীলকুঠির গোমস্তা দেশীয় খৃষ্টান স্মিথ তখন এক হাতিতে চড়ে যাচ্ছিলেন বাজারের মধ্য দিয়ে। সঙ্গে তাঁর ভৃত্য নওলোদ্দিন। গোলাম মাসুমরা প্রভু ভৃত্য দুজনকেই প্রহার করলো অকারণেই।

পুঁড়ার বাজারে তুলকালাম কান্ড ঘটিয়ে ইচ্ছামতী পেরিয়ে অপর পারের গ্রামে পৌঁছলো মৌলভীর দল। সেখানেও তিতুর অনুগামী ছিল অনেক। রাত্রে দুটি ষাঁড় মেরে মহাভোজ হলো। পরের দিন ৭ই নভেম্বর লাউঘাটি বাজার আক্রমণ করলো মৌলভীরা। এবার কিন্তু

ব্যাপারটা বিনা বাধায় সমাপন হলো না। জমিদার তনয় দেবনাথ রায়ের নেতৃত্বে হিন্দুরা বাধা দিতে এলো। মারাত্মক যুদ্ধ হলো লাঠি সড়কী আর তলোয়ারের। যুদ্ধে নিহত হলেন দেবনাথ রায়। তিতুর দলের সঙ্গে দেবনাথ রায়ের দলের যুদ্ধ সম্ভবতঃ বাংলাদেশের প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (দাঙ্গা শব্দের অর্থ 'মারামারি'; মারামারির মধ্যে দু-পক্ষই সক্রিয় থাকা দরকার। একপক্ষ যখন অন্য পক্ষের ওপর একতরকা আক্রমণ চালায় তখন সেই ঘটনাকে রায়ট বলা গেলেও দাঙ্গা বলা যায় না)। এর আগে শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াইএর নজির নেই।

লাউঘাট্টির যুদ্ধে বিজয়ের ফলে তিতুর অনুগামীদের মনোবল প্রভূত ভাবে বৃদ্ধি পেল। অভাবনীয় ভাবে বেড়ে গেল তাঁর অনুগামীদের সংখ্যাও। পরে তিতুমীরের দলের বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্যে অবশ্য প্রকাশ পেয়েছিল, অনেকেই স্রেফ লুটপাট করার ধান্দায় তিতুর দলে ঢুকেছিল।[৫.২০] এদিকে ফকির মিস্কিন শাহ্ এই সাফল্যকে আল্লাহ্র বর বলে ঘোষণা করলেন। জানালেন, জেহাদে কোনও মোমিন মরে না। ফলে অনেকেই সরল মনে বিশ্বাসী হয়ে উঠলো তিতুর জেহাদী মতবাদে। সাফল্য গর্বিত তিতু ঘোষণা করলেন, দেশে এখন মহম্মদের দ্বীনের রাজত্ব। অর্থাৎ দার-উল-হরব এখন দার-উল-ইসলাম। আমিই এই দার-উল-ইসলামের ইমাম। সুতরাং আমাকেই খাজনা দাও।

বলা বাহুল্য, জোর করে টাকায় ও ফসলে 'তোলা' আদায় করতে লাগলো মৌলভীরা। ঠিক এখনকার দিনের মস্তানদের মত। হিন্দুদের ত্রস্ত করার জন্য বিভিন্ন স্থানে গোহত্যাও করলো। কিছু হিন্দুকে ইসলামায়িতও করলো গোমাংস খাইয়ে। চললো নারী ধর্ষণও। হিন্দুর কন্যাকে জোর করে মুসলমানের সঙ্গে বিয়েও দিল। সমসাময়িক পত্র পত্রিকা ও সরকারী নথিপত্রে এ সমস্ত ঘটনার জোরালো সাক্ষ্য আছে। ১৬.১১.১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া গেজেটে রামচন্দ্রপুর গ্রামের ব্রাহ্মণদের মুখে গরুর মাংস গুঁজে দিয়ে ইসলামায়নের বর্ণনা আছে।[৪.৩১] কলভিনের রিপোর্টের ২৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে শুধু উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদেরই নয়, নিম্নবর্গের হিন্দু রায়তদেরও জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে।[৪.৩২] নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা এক প্রতিবেদনে লিখেছেন, মৌলভীদের দূত হয়ে আমার কাছে আসে এক ইসলামায়িত হিন্দু, যে আমাদের দলেই ছিল। মৌলভীরা তাকে বন্দী করে জোর করে ইসলামায়িত করে, মাথা কামিয়ে দাড়ি রাখায়...[৪.৩৩]

সর্বপরি আছে সাজন গাজীর গান। সেখানে আছে হিন্দুর কন্যাকে জোর করে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার কথা:

বামনের মেয়ে এনে নেকা দেয় কতো জনে
সাঁকা ভাঙ্গি হাতে দিল চুড়ি।
বামন গোনেরে ধোরে কলমা পড়ায় জোরে
চুল ফেলে মুখে রাখে দাড়ি।
গাও গোস্ত তারা খাইয়া কাপড় পড়ে ওন্দারা দিয়া
কাছা খুলে সবে গেল বাড়ী।।[৪.৩৪]

তিতুর এ ধরণের ভয়ঙ্কর উত্থানে আশপাশের সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগলো। পালালো অনেক সাবেকী মুসলমানও—যারা তিতুর মতবাদে সায় দিতে পারছিল না।[৪.৩৫]

কৃষ্ণদেব রায় পুঁড়া ও লাউঘাট্টির ঘটনার আগে তিতুমীরদের চালচলনের কথা বসিরহাট থানার দারোগা ও বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জানিয়েছিলেন। বারঘরিয়া নীলকুঠির গোমস্তাও বিপদের আঁচ পেয়ে চিঠি লিখেছিল। কিন্তু বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট বা বসিরহাট থানার দারোগা, কেউই তাতে বেশী আমল দেননি। দারোগা পুঁড়ার বাজারে দুটি বরকন্দাজ পাঠিয়েই কর্তব্য শেষ করেছিলেন। দারোগার হুঁশ হলো তখনই যখন তিনি তিতুকে ধরতে গিয়ে শুনলেন ৬০/৭০ জন মৌলভী তাকে খুন করার জন্য লাঠি সড়কী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দারোগার প্রতিবেদনে এ দুঃসংবাদ পেয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট তাড়াতাড়ি কদম্বগাছি ও কলিঙ্গা থানার দারোগাকে নির্দেশ দিলেন, বসিরহাট থানাতে বরকন্দাজ পাঠিয়ে থানাদারকে সাহায্য করতে।

এদিকে বারঘরিয়া নীলকুঠির সুপারিনটেন্ডেন্ট পিরোঁ তাঁর বণিক চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করলেন, গ্রামাঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলা নষ্টকারী মৌলভীরা অচিরেই তাঁদেরও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং পিরোঁর কাছ থেকে চিঠি গেল বারাসতে। পিরোঁ চিঠিতে জানালেন মৌলভীদের শক্তি ও উন্মত্ততার কথা।

পরের ঘটনা ১৪ই নভেম্বর। সেদিন গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে তিতুর বাহিনী আক্রমণ করলো নারকেলবেড়িয়া থেকে ৫/৬ মাইল দক্ষিণের শেরপুর গ্রাম। শেরপুর গ্রামে সম্পন্ন গৃহস্থ ইয়ার মহম্মদের বাড়ী। তিতুদের অভিযোগ, ইয়ার মহম্মদের সঙ্গে জমিদারদের যোগসাজস আছে। বাড়ী লুট করে গোলাম মাসুম জোর করে ইয়ার মহম্মদের বিধবা কন্যা মুক্তবের বিয়ে দিলেন তাঁর দলের মহীবুল্লার সঙ্গে। আর ইয়ার মহম্মদের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী খুরমার পাণি বলপূর্বক গ্রহণ করলো আর এক জেহাদী কালু। সপুত্র ইয়ার মহম্মদকে বাঁশের কেল্লায় ধরে নিয়ে গেল জেহাদীরা। অন্যান্য অনেককেও প্রহার করলো তারা।[৪.৩৬]

নভেম্বরের তেরো তারিখে ওই অঞ্চলের প্রধান নীলকর ষ্টর্ম একটি চিঠিতে সবকিছু জানিয়ে কলকাতায় সরকারের কানে জল ঢাললেন। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নিলেন সরকার। বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজান্ডারকে আদেশ দেওয়া হলো, বাগুন্ডিতে ডিভিশনাল কমিশনার বারলোর সঙ্গে পরামর্শ করে এমন কিছু ব্যবস্থা নিতে, যাতে বিদ্রোহীরা গ্রেপ্তার হয় এবং আন্দোলনটিকে সমূলে বিনষ্ট করা যায়। আলেকজান্ডারকে এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কলকাতা থেকে সৈন্য-সামন্ত সরবরাহ করারও আশ্বাস দেওয়া হল।

নির্দেশ অনুযায়ী ১৫ই নভেম্বর সকালে ১২৫জন সেপাই ও বরকন্দাজ নিয়ে বাগুন্ডি থেকে যুদ্ধ যাত্রা শুরু করলেন, আলেকজান্ডার। দ্বিপ্রহরে পৌঁছলেন নারকেলবেড়িয়ায়। পৌঁছে দেখলেন, শ ছয়েক ন্যাড়া মৌলভী এক জায়গায় সমবেত হয়েছে লাঠি সড়কী তলোয়ার বল্লম ইত্যাদি ডাকাতি করা এবং ডাকাতি প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবহার্য গ্রাম্য যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে।

সাহেব তাচ্ছিল্য ভরে কামানে গোলা ভরতে বললেন জমাদারকে। তারপর অযথা রক্তক্ষয়ের কথা চিন্তা করে নিজেই এগিয়ে গেলেন মৌলভীদের দিকে। কিন্তু মৌলভীরা তাঁকে সম্ভাষণ জানালো অবিশ্রান্ত ইঁটবৃষ্টি করে। তারপর আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিয়ে ধেয়ে এলো বৃটীশ সেনাবাহিনীর দিকে। তাড়াতাড়ি জমাদারকে গোলা ছুঁড়তে নির্দেশ দিলেন আলেকজান্ডার। জমাদার গোলা ছুঁড়লো; কিন্তু কাউকে আহত হতে দেখা গেল না। উল্টে উল্লাস ধ্বনি দিয়ে উঠলো মৌলভীর দল। এমন সময় একজন লোক খোলা তলোয়ার হাতে ধেয়ে

এলো সাহেবের দিকে। আত্মরক্ষার্থে তার দিকে গুলি ছুঁড়লেন সাহেব। গুলিটা আঘাত হানলো সেই মৌলভীর উরুতে। গুলি খেয়ে মৌলভী মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। এদিকে সাহেব দেখলেন তাঁর আশপাশ পাতলা হয়ে গেছে। রণে ভঙ্গ দিয়েছে অধিকাংশ সেপাই। এমনকি নিজের দেহরক্ষীটিকেও কাছে পিঠে দেখতে পেলেন না সাহেব। সুতরাং তিনিও রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছন পানে দৌড় মারলেন। মৌলভীরা রে রে করতে করতে ধাওয়া করলো কাফের সাহেবের পিছনে। প্রায় এক মাইল দৌড়ে গিয়ে একটা নালায় পড়লেন সাহেব। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন:

আলেকজান্ডার সাহেব বেগতিক দেখিয়া দ্রুত অশ্বারোহণে পলায়ণ করিলেন। সাহেব এখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। কোন দিকে, কোন পথে ঘোড়া ছুটিতেছে তাহার ঠিক নাই। ঘোড়া যথেচ্ছ দৌড়িতে দৌড়িতে ভড়ভড়িয়ার খালে পড়িয়া কর্দমে প্রোথিত হইল। সাহেব কর্দমাক্ত কলেবরে ভীত চিত্তে মুমূর্ষু-প্রায় হইলেন। কলিঙ্গার কয়েকজন ব্রাহ্মণ তাঁহার তাদৃশী শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহাকে কর্দম হইতে উদ্ধার করেন এবং ধীরে ধীরে তাহাকে আপনাদের গ্রামে লইয়া যান। পরে গ্রামের ভদ্রলোকেরা যথোচিত আহার পানীয়ে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে বাগান্ডীতে পৌঁছিয়া দিয়া আইসেন।[৪.৩৭]

এই অভিযানে গোলাম মাসুম ঘোড়ায় চড়ে নেতৃত্ব দেন জেহাদী মৌলভীদের। জনা তেরো সেপাই কাটা পড়েছিল মৌলভীদের তলোয়ারের কোপে। গুরুতর আহত হয়ে মৌলভীদের হাতে ধরা পড়েন বসিরহাট থানার পূর্বোক্ত দারোগা রামরাম চক্রবর্তী। তাঁকে বাঁশের কেল্লার মধ্যে টেনে নিয়ে যায় মৌলভীরা। জেহাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তিতু তাঁকে মুসলমান হতে বলেন। ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন রামরাম চক্রবর্তী। ফলে তিতুর নির্দেশে গোলাম মাসুম তাঁকে হত্যা করেন বাইরের মাঠে নিয়ে গিয়ে।

আলেকজান্ডারের শোচনীয় পরাজয় মৌলভীদের মনোবল একদিকে যেমন আকাশচুম্বী করে তুললো। অন্যদিকে গ্রামীণ মুসলমানদের অনেককে উদ্বুদ্ধ করলো তিতুর দলে যোগ দিতে। তিতুর নজর এবার গেল বারঘরিয়া নীল কুঠির দিকে।

বার ঘরিয়া নীল কুঠিতে তিতুর কিছু চর ছিল। তারা অনবরত তিতুর কানে তুলছিল পিরোঁর বিরুদ্ধ কার্যকলাপ। সুতরাং তিতু সিদ্ধান্ত নিলেন, বারঘরিয়া কুঠি আক্রমণ করে পিরোঁকে হত্যা করবেন। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে সপরিবারের গোবরডাঙ্গায় পালিয়ে গেলেন পিরোঁ। আশ্রয় নিলেন জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। কারণ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রচুর হাবসী সৈন্য মজুত রেখেছিলেন গোবরডাঙ্গায়। তিতুর পক্ষে গোবরডাঙ্গা আক্রমণ করা অসম্ভব ছিল।

আলেকজান্ডারকে নাকানি চোবানি খাইয়ে মৌলভীরা আক্রমণ করলো বারঘরিয়া কুঠি। ধ্বংস করলো কুঠির কারখানা, গুদাম এবং পিরোঁর সুদৃশ্য বাংলো। তছনছ করলো কুঠির যাবতীয় কাগজপত্র।

নারকেলবেড়িয়ার কাছে অন্য নীলকুঠিটি ছিল হুগলী গ্রামে। সেখানকার ম্যানেজার ব্লন্ড সাহেব। মৌলভীরা হানা দিল হুগলী কুঠিতেও। সাহেবকে মেম ও বালবাচ্ছা সমেত ধরে নিয়ে গেল তিতুর কাছে। তিতু তখন বাঁশের কেল্লার বাদশাহ। বুদ্ধিমান সাহেব হিন্দুসন্তান নন। তিনি অবিলম্বে তিতুকেই বাদশাহ বলে মেনে নিলেন এবং তিতুর হয়ে নীল বোনার অঙ্গীকার করলেন। ফলে 'জিম্মি' হয়ে সপরিবারে মুক্তি পেয়ে গেলেন খৃষ্টান ব্লন্ড। এবং

পরে স্বভাবতই তিতুর বিরুদ্ধে অভিযানে সরকারী সেনাবাহিনীকে সাহায্য করলেন। পরে আদালতে সাক্ষ্যও দিলেন তিতুর দলের বিপক্ষে।

নারকেলবেড়িয়ার কয়েকমাইল দূরে জঙ্গলপুরে ছিল শিলিংফোর্ড সাহেবের নীলকুঠি। ১৭ই নভেম্বর সেখানে হানা দিল তিতুর বাহিনী। বেগতিক দেখে শিলিং ফোর্ড ব্লন্ডেরই মত মোটা অঙ্কের অর্থদন্ড দিয়ে রক্ষা পেলেন মৌলভীদের হাত থেকে। ফেরার পথে মৌলভীরা জঙ্গলপুর বাজারে রামনারায়ণ পোদ্দার নামক এক কর্মকারের দোকান লুঠ করলো। একদল গিয়ে উপদ্রব করলো বনগাঁর কাছাকাছি সদর নীলকুঠিতেও। এইসব লুঠতরাজে নেতৃত্ব দিলেন কুরবান শাহ নামক এক ফকির।[৪.৩৮]

নারকেলবেড়িয়ার অপরপারে ইছামতীর তীরে সার সার অনেকগুলি নীলকুঠি ছিল। নীলকুঠিগুলির বেশ কয়েকটির মালিক ছিলেন অ্যান্ড্রুজ সাহেব। ওই অপরপার ছিল তৎকালীন নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অ্যান্ড্রুজ সাহেব স্বভাবতই, নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথের খুব কাছের লোক। ১৪ই আগষ্ট ষ্টর্মের মারফৎ তিতুর বিদ্রোহের খবর স্মিথের কাছে পৌঁছলে তিনি তিতুর বিরুদ্ধে অভিযানের সঙ্কল্প নিলেন। প্রথমে তিনি লোকজন ঠিক করে উপস্থিত হলেন রানাঘাটের জমিদার পাল চৌধুরীদের বাড়ীতে। সেখানে বসে অভিযানের বিস্তৃত পরিকল্পনা আঁটতে লাগলেন। একজন সহকারী প্রস্তাব রাখলো নীলকর অ্যান্ড্রুজের সহায়তা নেওয়ার। প্রস্তাবটা দাগ কাটলো সাহেবের মনে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা হাতচিঠি পাঠিয়ে দিলেন নীলকরের মোল্লাহাটি কুঠিতে। ওই সময়ে অ্যান্ড্রুজ কুঠিতে ছিলেন না। বেরিয়েছিলেন শিকার করতে। স্মিথ অ্যান্ড্রুজের কাছ থেকে চিঠি পাবার আগেই অভিযান শুরু করে দিলেন। পথে আর একটা চিঠি পাঠালেন অ্যান্ড্রুজকে। ১৬ই নভেম্বর অ্যান্ড্রুজের রুদ্রপুর কুঠিতে উপস্থিত হলেন স্মিথ। অ্যান্ড্রুজ তখন শিকারের শেষে মোল্লাহাটি কুঠিতে উপস্থিত এবং স্মিথের দুটি চিঠিই পাঠ করেছেন। স্মিথের চিঠির উত্তরে অ্যান্ড্রুজ জানালেন: উল্লিখিত উপদ্রবকারী দলটিকে বিতাড়নের জন্য আমি সর্বতোভাবে সাহায্য করবো আপনাকে। আমার সাতটা হাতিতো আছেই। আশপাশের জমিদার ও নীলকরদের সাহায্যে আমি যত বেশী সম্ভব লোকজন জোগাড় করতে সচেষ্ট।

অ্যান্ড্রুজ তাঁর কথা রেখেছিলেন। ম্যাকেঞ্জী, হল, সাদারল্যান্ড আর গার্ডেন—এই চারজন সহকারী, অন্যান্য লোক লস্কর হাতি বজরা সবকিছু নিয়ে স্মিথের সঙ্গে তিনিও তিতু দমনে বেরিয়েছিলেন। পরের ব্যাপারটা স্মিথের ভাষাতেই শোনা যাক:

সকাল সাড়ে নটার সময় আমরা পানসী ছেড়ে ডাঙ্গাতে উঠলাম। সেখানে আমরা নিশ্চিন্ত মনে হাতিতে উঠলাম এই বিবেচনায় যে, যাদের বিরুদ্ধে আমরা অভিযান নেমেছি তারা সংখ্যায় এবং অস্ত্রশস্ত্রে তেমন ভারী নয় (সে বিবেচনা ছিল সম্পূর্ণ ভুল)। সঙ্গে রইলো সংগ্রহ করা দু-তিনশো লোক এবং চোদ্দ পনেরোটা মাস্কেট এবং দোনলা বন্দুক। চললাম রুদ্রপুর কুঠি থেকে মাইল দেড়েক দূরে নারকেলবেড়িয়া গ্রামের দিকে। কিছুটা যাবার পর দেখি বহু সংখ্যক বিদ্রোহী এক জায়গায় জমায়েত হয়েছে আমাদের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য। বিদ্রোহীরা মারমুখী হতেই আমার দলের লোকেরা রণে ভঙ্গ দিতে লাগলো। সেই দেখে আমরা একই পথে বিচরণ করার উদ্দেশ্যে পিছনে ফিরতেই তারা ধেয়ে এলো আমাদের দিকে। আমাদের দুজন লোককে কেটে ফেললো তলোয়ারের কোপে। আমরা নদীর তীরে পৌঁছে কোনও রকমে পানসীতে উঠে গভীর জলে যেতেই দেখি নদীর তীরে

সারি সারি এসে দাঁড়িয়েছে তারা; ঢিল ছুঁড়ছে আমাদের দিকে। হাতের কাছে যাকে পাচ্ছে কেটে ফেলছে। পানসী থেকেই কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়লাম আমরা। কিন্তু তারা মাথা সরিয়ে নিয়ে গুলি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে ফেললো। তারপর নাচতে লাগলো আমাদের ব্যঙ্গ করে। অ্যানড্রুজ অবশ্য একজনকে মারতে সমর্থ হলো। সাজপোষাক দেখে তাকে একজন নেতা বলেই মনে হচ্ছিল। তারপর ওরা নৌকা যোগাড় করে আমাদের দিকে খেয়ে আসছে দেখে আমরা অপর পারে নেমে পড়লাম এবং কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচালাম প্রাণ ভয়ে মাইল খানেক দৌড়ে। আমাদের ফৌজদারী নাজিরকে কেটে ফেললো ওরা। আমারও ওই অবস্থা হতো যদি অ্যান্ড্রুজের হাতিগুলো ঠিক জায়গায় না থাকতো। অবস্থা এখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। মিলিটারী ডাকা ছাড়া এই উম্মাদগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করার সামর্থ কারোর নেই।

স্মিথের পরাজয়ের পর তিতুর মনোবল শিখর আরোহণ করলো। কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, প্রাণনাথ চৌধুরী ও অন্যান্য প্রধান জমিদারদের কাছে কর ও জেহাদের রসদ চেয়ে সন্ত্রাস লিপি পাঠালেন তিতু। তাতে ভয় দেখানো হলো, আদেশ না মানলে তাঁদের হেদায়েৎউল্লা অর্থাৎ ইসলামায়িত করা হবে সাত আট দিনের মধ্যে।[৪.৩৯, ৪.৪০]

কিন্তু শিখর আরোহণের পরেই অতল খাদে পতন। তাই ঘটলো তিতুর।

শেষ যুদ্ধ

পরাজিত হতমান আলেকজান্ডার উপনীত হলেন বাগুন্ডিতে, ডিভিশনাল কমিশনার বারলোর সম্মুখে। বারলো তাঁকে নির্দেশ দিলেন কলকাতায় চলে যেতে, সেখানে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে সবকিছু অবহিত করতে।

সেই অনুযায়ী জলপথে কলকাতা চলে গেলেন অ্যালেকজান্ডার। পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্যকভাবে বোঝালেন কর্তৃপক্ষকে। সেই অনুযায়ী সৈন্যদল পাঠানো হলো বিদ্রোহ দমনের জন্য। সৈন্যদলকে নির্দেশ দেওয়া হলো সরকার-বিরোধীদের ধ্বংস করার। এই সৈন্যদলের মধ্যে ছিল এগারো রেজিমেন্ট পদাতিক, কিছু অশ্বারোহী ও দুটি কামান। এছাড়া বারাসতে ভাইস প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কিছু সৈন্য এদের সঙ্গে যোগ দিল। এই সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিলেন আলেকজান্ডার। পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মেজর স্কট, গোলন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্বে লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড এবং অশ্বারোহী বাহিনীটি ছিল ক্যাপ্টেন সাদারল্যান্ডের নেতৃত্বে। সেনাবাহিনীর রসদ সহ সব কিছু সরবরাহের ভার ছিল স্থানীয় জমিদারদের ওপর।

তিতুমীরও আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। বিভিন্ন জমিদার কাছে পাঠালেন পূর্বকথিত 'বাদশাহী পরোয়ানা'। একজন নও মুসলমানকে দূত করে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথের কাছে সন্ত্রাসলিপি পাঠালেন, স্মিথ যেন বাদশাহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে না তোলে।

আঠারোই নভেম্বর অ্যালেকজান্ডার, সাদারল্যান্ড ও ম্যাকডোনাল্ড নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন নারকেলবেড়িয়ায়। বৃটীশ সৈন্যদের দেখে মৌলভীরা আল্লাহ আকবর শব্দে ধ্বনি দিয়ে উঠলো, যথেচ্ছ গালিগালাজ করতে লাগলো সিপাহীদের। ছোট্টখাটো কয়েকটা আক্রমণও চালালো। এই রকমই একটা আক্রমণে অ্যালেকজান্ডারের কান ঘেঁসে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। আর একটা গুলিতে তিতুমীর হত্যা করলো গোলন্দাজ বাহিনীর মেকানকে।

এদিকে সাহেবরা ঘাঁটি গেড়ে বসে রইলো। কারণ, তখনও পদাতিক বাহিনী এসে পৌঁছয়নি। সন্ধ্যা নাগাদ মেজর স্কটের নেতৃত্বে পদাতিক বাহিনী যোগদান করলো দলে। পরের দিন উনিশে নভেম্বরের প্রভাতে শুরু হলো প্রাণঘাতী সংঘর্ষ।

খোলা মাঠের মধ্যে কামান সাজিয়ে পদাতিক বাহিনী এগিয়ে গেল বাঁশের কেল্লার দিকে। ওদিকে সেই খোলা মাঠেই আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে গেল জেহাদীরা। জেহাদী বাহিনীর সেনাপতি গোলাম মাসুম একটি ঘোড়ায় চড়ে নির্দেশ দিতে লাগলেন জেহাদীদের। তাদের হাতে শুধুমাত্র লাঠি, সড়কী, বল্লম আর তলোয়ার। এবং সামান্য কয়েকটা মাস্কেট বন্দুক—যা তারা অ্যালেকজান্ডার ও স্মিথের বাহিনীকে পরাস্ত করে সংগ্রহ করেছিল। জেহাদীদের সামনের সারিতে বল্লম গাঁথা মেক্লানের ছিন্নভিন্ন দেহ উঁচু করে ধরা।

প্রথম গুলিটি চলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিয়ে উঠলো জেহাদীরা। কিন্তু পদাতিকেরা এগিয়ে গেল এবং সুরু করলো গুলিবর্ষণ। তাতে দু-একজন পড়ে গেল বটে, কিন্তু থমকালো না জেহাদীরা। কারণ, ফকির মিস্কিন শাহ তাদের বুঝিয়ে ছিলেন, জেহাদীরা কখনও কাফেরের গোলাগুলিতে মরে না। আগের কদিনের যুদ্ধে তাদের সেই প্রত্যয় ঘনীভূত হয়েছে। কিন্তু পদাতিক বাহিনীর ব্যাপক গুলিবর্ষনে যখন অনেকেই ভূমিশয্যা নিল তখন জেহাদীরা পিছু ফিরে আশ্রয় নিল বাঁশের কেল্লার মধ্যে। সেখান থেকে ইঁট, বেল ইত্যাদি বর্ষণ করতে লাগলো অবিরত।

আরও এগিয়ে গেল পদাতিকেরা। বাঁশের কেল্লা লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করতে লাগলো গোলন্দাজেরা। ঘন্টা খানেক তুমুল লড়াই এর পর ধ্বংস হলো বাঁশের কেল্লা। শহীদ হলো তিতু সহ পঞ্চাশ জন জেহাদী। আহত হলো জনা ত্রিশ। তাদের মধ্যে পরে মারা গেল তিনজন। বৃটীশের হাতে বন্দী হলো আড়াইশো জন। সংঘর্ষে সিপাহীদের মধ্যে সতেরো জনের মৃত্যু ঘটলো।

তিতু সহ পঞ্চাশজন জেহাদীর মৃতদেহ সেদিনই পুড়িয়ে ফেলা হলো বাঁশের কেল্লার বাঁশ দিয়ে। কারণ, না হলে গ্রামবাসীরা তাদের বীরের সম্মান দিয়ে কবরস্থ করবে।

এইভাবেই সমাপ্ত হলো তিতুমীরের জেহাদ তথা গ্রামবাংলার সাম্প্রদায়িক শান্তির পরিবেশে তাঁর বিচ্ছিন্নতাবাদী শরিয়তী ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। বন্দী জেহাদীদের জলপথে নিয়ে যাওয়া হলো কলকাতায়। রাখা হলো তাদের প্রথমে রসাপাগলা জেলে। পরের আলীপুর জেলে। বিচার চললো অনেকদিন ধরে। মোট ১৯৭ জনকে অভিযুক্ত করা হলো নানা মামলায়। বিচার চললো অনেকদিন ধরে। তলব করা হলো অনেক সাক্ষীকে। আসামীদের মধ্যে ছিল তিতুর মেজো ছেলে, একুশ বছরের তোরাব আলী ও ছোট ছেলে উনিশ বছরের গোহর আলী। তোরাব আলীর অল্প বয়সের কথা বিবেচনা করে তাকে দুবছরের জন্য কারাদন্ড দেওয়া হলো। তোপে গোহর আলীর এক পা বাদ যাওয়াতে তাকে কোনও শাস্তি দেওয়া হলো না। তিতুর সেনাপতি গোলাম মাসুমের মৃত্যুদন্ড হলো। যাবজ্জীবন কারাদন্ড হলো একুশ জনের। ন জনকে দেওয়া হলো সাত বছরের কারাদন্ড। ছ বছরের মেয়াদ পেল আরও ন জন। ষোল জনের হলো পাঁচ বছরের মেয়াদ। চৌত্রিশ জনের তিন বছরের মেয়াদ। দু বছরের মেয়াদ বাইশ জনের। তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করেও কোনও দন্ড দেওয়া হলো না। উনপঞ্চাশ জনকে নির্দোষ সিদ্ধান্ত করা হলো। এর মধ্যে ফটিক পাঠক বলে এক হিন্দু সাধুকে বাঁশের কেল্লার মধ্যে গ্রেপ্তার করা হলেও দেখা গেল যে সে পাগল। গোলাম মাসুমের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হলো নারকেল বেড়িয়াতেই—ধ্বংসপ্রাপ্ত বাঁশের কেল্লার সামনে, সর্বজন সমক্ষে।

৫ / উত্তর কথা

নারকেলবেড়িয়ার জঙ্গ বিবৃত হলো। একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই দেখা যাবে সমগ্র জঙ্গটি বিভক্ত রয়েছে তিনটি স্তরে।

প্রথম স্তরে ঠান্ডা লড়াই—যেখানে তিতুমীর সামাজিক সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত করে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিমন্ডল বিষাক্ত করে, শরিয়তী ইসলামের প্রবেশ ঘটাচ্ছেন বারাসতের গ্রামীন পরিবেশে।

দ্বিতীয় স্তরে ঠান্ডা লড়াই এ নতুন মাত্রা সংযোজিত হচ্ছেঃ স্যায়িদ আহমদ বেরিলবীর পেশোয়ার বিজয়ের সংবাদে উদ্ধত হয়ে উঠছে মৌলভীরা।

তৃতীয় স্তরে জঙ্গ রূপান্তরিত হচ্ছে যথার্থ জেহাদে। ইমাম তিতুমীর জেহাদ ঘোষণা করছে কাফেরদের বিরুদ্ধে। জেহাদ ঘোষণার অনুপ্রেরণা বেরিলবীর শহীদত্বের সংবাদ। তিতুমীরও জেহাদের জন্য শপথবদ্ধ। মুরিদ তো মুর্শেদের অনুগামী হবেই। আর জেহাদে শহীদত্ব একগ্লাস ঠান্ডা শরবৎ খাওয়ার চেয়েও মনোরম!

গৌতম ভদ্র[৫.১] তিতুমীরের জেহাদকে বেরিলবীর সর্বভারতীয় জেহাদের অংশ বলে মানতে রাজী নন। মানতে রাজী নন যে বেরিলবীর পেশোয়ার বিজয় পূজত মল্লিকদের পীরের দরগায় লাথি মারতে প্ররোচিত করেছিল। তিনি লিখেছেন, সমসাময়িক সরকারী দলিলে বেরিলবীর পেশোয়ার দখলের কোনও উল্লেখ নেই। অর্থাৎ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর খাতায় লেখা না থাকায় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পেশোয়ারের পতন আদৌ ঘটেনি। সুতরাং পেশোয়ার বিজয়ের সংবাদে মৌলভীদের অত্যুৎসাহী হয়ে ওঠার কোনও প্রশ্নই নেই।

এ ধরণের যুক্তি কতটা মানা যায়, সেটা পাঠকেরই বিবেচ্য। বেরিলবীর জেহাদের সংবাদ কোম্পানীর প্রকাশ্য দলিলগুলিতে থাক বা না থাক উপরতলার আমলারা যে সে বিষয়ে ভালই অবহিত ছিলেন তা মেটকাফের পত্রাদিতে প্রকাশিত। ২২.৬.১৮২৭ তারিখে মেটকাফ 'লিখেছেন, স্যায়িদ আহমদ, মৌলভী ইসমাইল এবং তাদের সহকর্মীরা আমাদের মুসলমান প্রজাদের মনে সুদূর প্রসারী ছাপ ফেলেছেন। রণজিৎ সিংহের রাজত্বের ওপর তাদের সাম্প্রতিক আক্রমণের সময় যুদ্ধের সাফল্যের জন্য উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র মুসলমান জনগোষ্ঠির মধ্যে। অনেকেই ঘর ছেড়ে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। সেই সব ঘরছাড়াদের অনেকেই কার্যরত ছিলেন কোম্পানীর সামরিক ও অসামরিক দপ্তরে। কথিত হচ্ছে দিল্লীর সুলতানও সর্বদা এই জেহাদকে উৎসাহিত করছেন।[৫.২]

জেহাদীদের সঙ্গে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের নাড়ীর টানটুকু মেটকাফের চিঠিতে স্পষ্টাক্ষরেই বর্ণিত। সুতরাং হান্টার যখন লেখেন, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মৌলবাদীদের দ্বারা পেশোয়ার বিজয় তিতুমীরকে সব ছদ্মবেশ ফেলে দিতে প্ররোচিত করেছিল, তখন সেটিকে অনৃতভাষণ বলে অবজ্ঞা করা যায় না। বিশেষতঃ আমরা যখন দেখেছি, পেশোয়ার বিজয়ের পর হিন্দুস্থান থেকে বহু নতুন জেহাদী যোগ দেয় বেরিলবীর শিবিরে। সে সময়ে টেলিগ্রাফ প্রচলিত ছিল না ঠিকই। তবুও জেহাদের বার্তা সারা হিন্দুস্থান ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশী সময় লাগতো না'। বিশেষতঃ আমাদের জানা আছে যে বেরিলবীর শহীদত্বের সংবাদ ৩/৪ মাসের মধ্যে

পৌঁছে গিয়েছিল সুবে বাংলায়। আবার বেরিলবীর সুবে বাংলার মুরিদরা যে মূল 'তরিকা' আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না তার প্রমাণ বিভিন্ন ওয়াহাবী সাহিত্য নারকেলবেড়িয়া অঞ্চলে প্রচার। এই ওয়াহাবী সাহিত্যগুলি হলো, সিরাত-ই-মুস্তাকিম, হিদায়াৎ-উল-মোমিনিন এবং তাকিয়াৎ-উল-ইমান।[৫.৩] সুতরাং পূজত মল্লিকদের পেশোয়ার বিজয়ের সংবাদ পাওয়া এবং তার ফলে নিজস্ব মত কায়েম করার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক।

রাষ্টগুরু সুরেন্দ্রনাথ তিতুমীরকে বৃটীশ বিরোধী হিরো বানালেও সেকুলার লেখকেরা তিতুমীরের বিদ্রোহকে 'কৃষক সংগ্রাম' রূপে পরিবেশন করেছেন। যেমন, শান্তিময় রায়, সুপ্রকাশ রায়, বিনয় ঘোষ, নরহরি কবিরাজ, স্বপন বসু, স্বর্ণ মিত্র প্রভৃতি। এঁদের বক্তব্য বারাসত বিদ্রোহ আদতে 'কৃষক বিদ্রোহ' আর শ্রেণী সংগ্রাম।' এঁরা অনেকে 'ধর্ম' কে একেবারে উড়িয়ে দেননি। তবে 'শ্রেণী সংগ্রামে' ধর্মকে 'ব্যবহারের' কথা বলেছেন। ধর্ম কারো কারো মতে 'পোষাক''। কেউ বলেছেন ধর্ম 'প্রকার বা ফর্ম', আদত ব্যাপার বা কনটেন্ট হলো শ্রেণী সংগ্রাম। কারো কারো মতে এই লড়াই হচ্ছে ভবিষ্যৎ জনযুদ্ধের দৃষ্টান্ত।

গৌতম ভদ্র[৫.৪] বলেছেন, এঁদের সবারই প্রেরণা ক্যান্টওয়েল স্মিথ।[৫.৫] এরা প্রত্যেকেই স্মিথের মতাদর্শে শ্রেণী সংগ্রামের খড়ের কাঠামোটি আগে বানিয়ে নিয়ে প্রয়োজন মত মাটি আর রং দিয়ে কৃষক বিদ্রোহের প্রতিমাটি গড়ে তুলেছেন। আশে পাশে ছড়িয়ে আছে আরো মাটি আরও রং। সে বিষয়ে কারো খেয়াল নেই। কেউ বলেননি তিতুমীর বেরিলবীর সঙ্গেই হজে গিয়েছিলেন। কেউ জানাননি পাঞ্জাব থেকে ফকিরদের নারকেলবেড়িয়া আগমনের তাৎপর্য। কিন্তু এই তথ্যগুলির গুরুত্ব অসীম। ইসলাম সম্পর্কে কারো কোনও জ্ঞান চোখে পড়ে না। বিনা ইসলাম জ্ঞানে তরিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান উপলব্ধ হওয়া অসম্ভব। অসম্ভব তিতুমীরকে বোঝাও।

এক লেখক[৫.৬] তিতুমীরকে বৃটীশ শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধের প্রথম শহীদ বানিয়েই ক্ষান্ত হন নি। তিনি বলেছেন, এই বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া ভুল। যাঁরা দিতে চান তাঁরা সত্যের উপাসক নন। বিশেষ কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যই এই মুসলিম দেশ প্রেমিকদের কাহিনীগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার কালিমা লেপন করেন।

ওই লেখকের জানা নেই যে, মুসলমানরা পৃথিবীর তাবৎ দেশকে দার-উল-ইসলাম ও দার উল-হরবে ভাগ করে। তাদের দেশপ্রেম মানে দার-উল-ইসলাম প্রেম। দার-উল-ইসলাম নিশ্চয় প্রচলিত ধারণার 'স্বাধীন দেশ' নয়।

আর ওই লেখকই একমাত্র সত্যদ্রষ্টা; সুতরাং তিনি যা বলেছেন সেইটাই আপ্তবাক্য! অন্য কেউ যদি যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ সহযোগে অন্য কথা বলেনও, সেটা অবশ্যই মিথ্যা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত? সুপ্রকাশ রায়[৫.৭] তিতুমীরকে স্থান দিয়েছেন তাঁর কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বইতে। রায়ের 'বঙ্গদেশের ওয়াহাবী বিদ্রোহ' নক্কারজনক মিথ্যায় পরিপূর্ণ। থর্ণটনের হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া ছাড়া অন্য যে বইগুলি রায় ব্যবহার করেছেন সেগুলি ইতিহাস পদবাচ্য নয়। সে কারণে নানা বিভ্রান্তিতে নিজেকে জড়িয়েছেন রায়। যেমন, বেরিলবীকে মক্কায় পাঠিয়েছেন ১৮২০ খৃষ্টাব্দের আগেই। সেখান থেকেই বেরিলবী নিয়েছেন 'ওয়াহাবী আদর্শ!' তিতুমীর মক্কায় বেরিলবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ১৮২০ খৃষ্টাব্দের আগেই! ১৮২১ খৃষ্টাব্দে দুজনের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে! দুদুমিঞা ফরাজী আন্দোলনের প্রবর্তক

ইত্যাদি। বিনয় ঘোষ, নরহরি কবিরাজ বা স্বপন বসুর মত দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটার পরিশ্রম বিন্দুমাত্র স্বীকার করেননি রায়। সুতরাং আলোচনার বাইরে রইলো তাঁর বক্তব্য।

অমলেন্দু দে[৫.৮] তাঁর ইতিহাস চর্চায় আবদুল গফুর সিদ্দিকীকেই গুরু বলে মেনে নিয়েছেন। তাই গাদাগাদা উদ্ধৃতি দিয়েছেন সিদ্দিকী থেকে। তিতুমীর সেখানে চিঠি লিখেছেন কৃষ্ণদেব রায়কে—যে ভাষায় সিদ্দিকী বই লিখেছেন, সেই ভাষাতেই। কৃষ্ণদেব আবার তিতুকে অহাবী বলে বদনাম দিয়েছেন! সেই ১৮৩১ খৃষ্টাব্দেই তিতুর 'অহাবী' বিশেষণ জুটে গেছে কৃষ্ণদেবের মুখে? তাহলে বৃটীশ ইতিহাস লেখকরা তরিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলনকে ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলন আখ্যা দিয়ে দোষ করলেন কোথায়? অমলেন্দু দে ইতিহাস থেকে দূরে আছেন। বিনয় ঘোষ[৫.৯] তিতুমীরের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গেছেন। কিন্তু উনি ইসলামের কিছুই জানতেন না। সে কারণে তামাক খেয়েছেন স্যায়িদ আমীর আলীর হাতে। আমীর আলী থেকে লম্বা একটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন:

"ইসলাম জাত বা বর্ণের কোনও পার্থক্য স্বীকার করে না; কালো বা সাদা, নাগরিক বা সৈনিক, শাসক বা প্রজা, তারা সবাই সমান, শুধু তত্ত্বেই নয়, বাস্তবেও। মাঠে বা বৈঠকখানায়, তাঁবুতে বা প্রাসাদে, মসজিদে বা বাজারে, তারা স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন, একনিষ্ঠ অনুগামী এবং একান্ত শিষ্য ছিলেন একজন নিগ্রো ক্রীতদাস... মহম্মদের সমগ্র শিক্ষা ইসলামে জাতবিভাগ অসম্ভব করে তুলেছে। এবং ইসলামী আইনের কোনও শব্দকে ক্রীতদাসত্ব রূপে বর্ণনা করা শব্দের অপব্যবহার করা ছাড়া কিছুই নয়।"

এর পর বিনয় ঘোষ বলেছেন, এই যদি ইসলাম হয়...

'যদি'র ওপর নির্ভর করে উনি তিতুমীরের ধর্মের সাতকাহন লিখে গেছেন। অথচ স্যায়িদ আমীর আলীর রচনাটি নিতান্তই প্রচার মূলক: বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। বিনয় ঘোষ ইসলামের অ, আ, ক, খ জানতেন না। উনি লিখেছেন, "ঈশ্বর ঈশ্বর, মানুষ মানুষ, মধ্যবর্তী স্তরে আর কিছু নেই। ইসলাম ধর্মের এইটাই মূলকথা।"

অর্থাৎ উনি পয়গম্বর তত্ত্ব অস্বীকার করছেন। বোঝা যাচ্ছে উনি ইসলামের মূল স্তম্ভ 'কলেমা' জানতেন না। শাহ ওয়ালীউল্লার দোহাই দিয়ে উনি লিখেছেন, "ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্তী কোনও পীরপয়গম্বরাদি কেউ নেই, যেমন হিন্দুদের বহুদেবতার সঙ্গে আছে বহু অবতার পুরোহিত ইত্যাদি।" অর্থাৎ 'পয়গম্বর' শব্দটিরও উনি অর্থ জানতেন না। না জেনে পন্ডিত প্রবর লিখে গেছেন "শাহ ওয়ালীউল্লা ইসলামধর্মের মনোরম বাগিচা থেকে সমস্ত আগাছা পরগাছা জঞ্জাল আবর্জনা নির্মমভাবে নির্মূল করার পক্ষপাতী ছিলেন।"

যে 'বাগান' উনি কদাচ দেখেননি সে বাগানকে মনোরম বলা আর অন্ধের নিসর্গশোভা দর্শন একই ব্যাপার।

আরও মজার কথা উনি শাহ ওয়ালীউল্লা এবং মহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবকে ফান্ডামেন্টালিষ্ট আখ্যা দিয়েও আবার প্রগতিশীল বলেছেন। ইসলামে ফান্ডামেন্টালিজম মানে সপ্তম শতাব্দীর আরবে ফিরে যাওয়া। সেটা কি প্রগতিশীলতার লক্ষণ?

বিনয় ঘোষ শাহ ওয়ালীউল্লার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যে মানুষ খেটে খাওয়া মানুষদের গরু ছাগল বলে ভাবে, বিদেশীকে ডেকে আনে স্বদেশ আক্রমণের জন্য, তার প্রশংসা কোন মানসিকতা থেকে আসে?

এবার আসা যাক স্যায়িদ আমীর আলীর উক্তিতে। ওইসব উক্তি বহুল প্রচলিত। কিন্তু মিথ।

মুসলমান সমাজ মূলতঃ দাস-প্রভুর সমাজ। দাস প্রথা ওই সমাজে এতই বদ্ধমূল যে মুসলমানদের সবচেয়ে প্রচলিত নাম হচ্ছে আব্দুল। আব্দুল মানে (ওমুকের) দাস। এই দাস প্রথার মূল আছে কোরাণেই। বস্তুতঃ মানুষে মানুষে, মুসলমানে মুসলমানে এবং মুসলমানে-অমুসলমানে কোরাণে যে সামাজিক সম্বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে, তারমধ্যে সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হচ্ছে দাস-প্রভু সম্পর্ক। কোরাণের আয়াত:

And Allah hath favoured some of you above others in provisions. Now those who are more favoured will by no means hand over their provisions to those (slaves) whom their right hand possesses, so that they may be equal with them in respect there of. Is it then the grace of Allah that they deny? (K 16/71 মহম্মদ পিক্থহলের অনুবাদ)

[আল্লাহ তোমাদের কাউকে কাউকে খাদ্যবস্ত্রের দিক দিয়ে বেশী অনুগ্রহ করেছেন। যারা বেশী অনুগ্রহ পেয়েছে তারা সেই রসদ তাদের ডান হাতে পাওয়া দাসদাসীদের দেয়না, কেননা তাতে তারা অশনে বসনে মনিবদের সমান হয়ে যাবে। আল্লাহর এই অনুগ্রহ তারা (= মনিবরা) কি অস্বীকার করে?]

এতো গেল দাসদের কথা। দাসীদের খাটানো বা বিক্রয় করা ছাড়াও যে দৈহিক সম্ভোগের সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এ সম্পর্কের কোরাণের ৪/২৪ আয়তে বলা হয়েছে, দাসী সধবা হোক আর কুমারী হোক, তাদের অবাধে ভোগ করা যাবে।

ইসলামে দাসপ্রথা সম্পর্কে টমাস প্যাট্রিক হিউয়েজ লিখেছেন, The slavery of Islam is intenwoven with the law of marriage, the law of sale and law of inheritance of the system and its abolition would strike at the very foundation of Muhammadanism.[৫.১০]

ভারতে দাস প্রথা নিষিদ্ধ হয় ইংরেজের বিধানে। তুর্কী সাম্রাজ্যে এই প্রথা নিষিদ্ধ হয় ইংরেজের চাপে অর্থাৎ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরে (১৮৫৫-৫৬)। কিন্তু খোদ আরবভূমি তুর্কি সুলতানদের এই আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে খলিফা তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

বস্তুতঃ দাস ও প্রভু সম্পর্ক ইসলামী সমাজে চরম ও পরম জিনিষ। কিন্তু দাসকূলের বহিস্থ মুসলমানরা সামাজিক সাম্যের সম্পর্কে সম্পন্ন নন। মুসলমানদের মধ্যে বেশী নেক নজর পাওয়া গোষ্ঠি হচ্ছে কোরেশ গোষ্ঠি। এই গোষ্ঠির মধ্যেই স্বয়ং পয়গম্বরের আবির্ভাব ঘটে। কোরাণে প্রথম যুগের দুটি সুরাতে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহভাজন গোষ্ঠি হিসাবে কোরেশ গোষ্ঠির গুনগান করা হয়েছে। সুরা ফিলে বলা হয়েছে, পয়গম্বরের জন্মের বছরে আল্লাহ পাখীদের মুখ দিয়ে পাথর কুচি মেরে মেরে খতম করেন কোরেশদের হাবশী শত্রুদের এবং অলৌকিকভাবে বজায় রাখেন মক্কার স্বাধীনতা। সুরা কোরেশে বলা হয়েছে আল্লাহই কোরেশদের শক্তিমান করেন এবং দিকে দিকে ও শীতে গ্রীষ্মে তাদের সার্থবাহ পাঠিয়ে তাদের ধনসম্পদ যোগান।

কোরেশদের সঙ্গে অন্য মুসলমানদের বৈষম্যের কথা আছে হাদিশে। সহী মুস্লিমের ৪৪৭৩

নং হাদিশে আছে সমস্ত মানবজাতিই কোরেশদের তাঁবেদার, যারা মুসলমান তারা মুসলমান কোরেশের তাঁবেদার, যারা কাফের তারা কাফের কোরেশের তাঁবেদার।

অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে কোরেশরা হচ্ছে বড় ভাই। সেই সঙ্গে যোগ করা যায় স্যায়িদরা (সৈয়দ) হচ্ছে আরও বড় ভাই। কারণ তাঁরা শুধু কোরেশই নন। তাঁরা খোদ পয়গম্বরের বংশজাত কোরেশ। আরবী স্যায়িদ কথাটির অর্থ 'প্রভু'।

পয়গম্বর স্পষ্ট বাক্যে বিধান দিয়ে গেছেন খলিফার পদ কখনও কোরেশ জাতির বাইরে যেতে পারবে না।

পয়গম্বর স্বীকৃত এই কোরেশ অকোরেশ ভেদাভেদ খলিফাদের আমলে আরব-আজমের (অনারবের) ভেদাভেদে রূপান্তরিত হয়। কোনও কোনও খলিফা আজম মুসলমানদের কাছ থেকে জিজিয়া করও আদায় করতেন। ভারতের হিন্দুবংশজাত মুসলমানরা তুর্কি বিজেতাদের কাছ থেকে কাফেরের বেশী মর্যাদা পায়নি। তুর্কি জন্ম-গর্বিত জিয়াউদ্দিন বারাণী ভারতীয় মুসলমানদের বলতেন low born bazar people. অর্থাৎ অন্ত্যজ জাতি। ওই সময়ে আশ্রফ-আজলভের ভেদাভেদটাও পাকা হয়। আশ্রফ মানে সম্ভ্রান্ত। এঁদের কেউ শেখ, কেউ স্যায়িদ, কেউ মোগল, কেউ পাঠান। অর্থাৎ আশ্রফরাও একীভূত গোষ্ঠী নন। কিন্তু আজলফ বা বাজে লোকেদের সঙ্গে অর্থাৎ হিন্দুজাত মুসলমানদের সঙ্গে এদের পার্থক্য মনিবের সঙ্গে গোলামের পার্থক্যের চেয়ে কম নয়।

এই আজলফদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য হচ্ছে বঙ্গদেশী মুসলমানদের দল। অবাঙালী মুসলমানরা তাদের মুসলমান বলেই মনে করে না। '৭১ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় পাঞ্জাবী মুসলমানরা মুশরিক হিন্দু আর বঙ্গদেশী মুসলমানদের এক গোয়ালের গরু বানিয়ে লাখে লাখে হত্যা করে। হিন্দুর মেয়ে আর মুসলমানের মেয়েকে তারা সমভাবে টেনে নিয়ে যায় বাঙ্কারে। এর জন্যে পাঞ্জাবী মুসলমানদের মুসলিম জাহাঁর কাছে কোনও জবাবদিহি করতে হয়নি।

তবে একথা অনস্বীকার্য কোরাণ-হাদিশে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে, "মুসলমান যেন মুসলমানের রক্তপাত না করে, কেননা তারা ভাই ভাই।" কিন্তু এটা কোনও সামাজিক সাম্যের বাণী নয়। মুসলমান মুসলমানের রক্তপাত করবে না, এ কথার অর্থ এমন নয় যে গোলাম মুসলমানের গোলামী তুলে দিয়ে মনিবের সমান সামাজিক মর্যাদা দিতে হবে। এমনও নয় যে কোরেশ অকোরেশে সমান সামাজিক মর্যাদা পাবে, বা এমনও নয় যে আরব মুসলমান অনারব মুসলমানকে, স্যায়িদ মুসলমান জোলা মুসলমানকে কন্যাদান করবে। সুরা আহজাব বলে কোরাণ একটা বিখ্যাত অধ্যায় আছে। ওই সুরা নাজিল হওয়ার আগে পয়গম্বর মদিনায় এসে একজন মোহাজির বা মক্কা আগতের সঙ্গে একজন আনসার বা মদিনাবাসী মুসলমানের ব্রাদারহুড পত্তন করেন। কিন্তু আল্লাহ এই সুরায় পরিষ্কার বিধান দিলেন:

"The owners of kinship are closer one to another in the ordinance of Allah than (other) believers and fugitives, who fled from Mecca (K 33/6)

অর্থাৎ পাতানো ভ্রাতৃত্ব থেকে নিকটতর সম্পর্ক হচ্ছে রক্তের সম্পর্ক।

সুতরাং কি তত্ত্বের দিক দিয়ে, কি বাস্তবে, স্যায়িদ আমীর আলীর বক্তব্য সত্য থেকে বহু দূরে।

বিনয় ঘোষ খুব ঘটা করে নিগ্রো ক্রীতদাস মুয়াজ্জিনের কথা উৎকলিত করেছেন। মুয়াজ্জিন কথাটির অর্থ কি উনি জানতেন? সম্ভবতঃ না। যিনি পীরের সঙ্গে পয়গম্বর শব্দটি একসঙ্গে উচ্চারণ করেন তারপর শাহ্ উয়ালি-উল্লার দোহাই দিয়ে নবীকে বাদ দেন ইসলাম থেকে, মুয়াজ্জিন শব্দের অর্থ তাঁর না জানাই স্বাভাবিক।

বড় বড় মসজিদে মিনার থেকে যে আজান দেয় তাকে বলে মুয়াজ্জিন। আজান হচ্ছ নামাজ পড়ার ডাক। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বিলাল ছিলেন একজন হাবসী বাঁদীর পুত্র। এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। হিন্দুদের পূজায় যারা প্রতিমা গড়ে বা যারা বাজনা বাজায় তারা কিছু উচ্চবংশজাত নয়। তার মানে এই নয় যে হিন্দু সমাজে কুম্ভকার বা বাদ্যকরকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়।

বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীরা যে সেমীয় একেশ্বরবাদের বিন্দু-বিসর্গ না জেনে একেশ্বরবাদের প্রশংসা করেন, আর কিছু না বুঝেই পূর্বপুরুষদের সনাতন ধর্মকে অযথা গালিগালাজ করেন, বিনয় ঘোষের আলোচ্যমান প্রবন্ধ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সব মিলিয়ে বিনয় ঘোষের তিতুমীর চর্চা নক্কারজনক এবং নস্যাৎ যোগ্য [যাঁরা ইসলামে সাম্য এবং অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক তাঁরা প্রখ্যাত ইসলামতত্ত্ববিদ সুহাস মজুমদারের মূল্যবান পুস্তিকা পড়তে পারেন[৫.১১]]।

তবে গৌতম ভদ্র বলেছেন বলেই কি 'তরিকা-ই-মহম্মদীয়া' আন্দোলন কৃষক বিদ্রোহের মর্যাদা পাবে না?

না। সত্যান্বেষীদের নিজের পিতার বাক্যকেও বিনা প্রমাণে গ্রহণ করা কর্তব্য নয়। কোনও কিছু ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলেই তা সত্য হয়ে যায় না। এমনকি সাদা চামড়ার সাহেব ছাপলেও না। তা যদি হতো তাহলে তো সাদা চামড়ার বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাবিদ কাল মার্কস[৫.১২] বা কালো চামড়ার কৃষক-সংগ্রামী চিন্তাবিদ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর[৫.১৩] বক্তব্য উদ্ধৃত করে এক কথায় বলে দেওয়া যেত, চোপ! ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক।

সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, তিতুমীরের আন্দোলনের মধ্যে কোথাও কী শোষক X কৃষক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল?

না, জমিদারদের উৎপীড়নটা অর্থনৈতিক ঝোঁক পরিগ্রহ করেছিল দাড়ির ওপর আড়াই টাকা কর ধার্যের মধ্যেই। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের আড়াই টাকা সমকালীন দৃষ্টিতে প্রচুর মানের। মৌলভীরা কি ক্ষুব্ধ হয়েছিল সেই কারণে? না, ওই আড়াই টাকা এক আধজন দিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু তিতুমীর উত্তেজিত হয়েছিলেন শরিয়তে আঘাত লাগার জন্য। জরিমানাটা দু পাই হলেও তিতুমীর মেনে নিতেন না। কারণ, দাড়ি রাখাটা কোনও ফ্যাসানের ব্যাপার নয়, শরিয়তী আচার। এখানে কৃষক চেতনা পর্যবসিত হয়েছিল মোমিন চেতনায়। জমিদারদের সর্বদা মুশরিক কাফের হিসাবেই দেখছিলেন জেহাদী তিতুমীর। বাকী খাজনার দায়ে দু-একজনকে মারধোর করার মধ্যেও সেই কাফের X মোমিন চেতনাই বিরাজ করছিল। জমিদারেরা তিতুমীরের শরিয়তী মানসিকতা মেনে নিচ্ছিলেন না। সংঘর্ষের চেতনা সর্বদাই ছিল মোমিন X কাফের।

ঐতিহাসিক থর্ণটন বলেছেন, জরিমানা ধার্য্য করার উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের আয় বৃদ্ধি।[৫.১৪] কিন্তু আয় বৃদ্ধিই যদি কৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে জরিমানার হার হতো আড়াই পয়সা—আড়াই টাকা নয়। দাড়িটা যদি ফ্যাসন হতো তাহলে অসন্তোষ প্রকাশ করেও

সবাই আড়াই পয়সা দিয়ে দিত। আয় বাড়তো জমিদারের। কিন্তু জরিমানাটা প্রতিরোধমূলক ছিল বলেই তার হার ছিল অত্যন্ত চড়া। এছাড়া জমিদাররা কয়েকজনের দাড়িও কেটে দিয়েছিলেন। সুতরাং থর্ণটনের বক্তব্য ধোপে টেকে না।

অভিজিৎ দত্ত[৫.১৫] জোলাদের বিদ্রোহের উৎসে অর্থনৈতিক কারণ নির্দেশ করলেও সে রকম কোনও যুক্তির অবতারণা করেননি। বক্তব্যের সমর্থনে তিনি ভারতীয় তাঁতিদের ওপর বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু বিদ্রোহটা শুধু বসিরহাট অঞ্চলে হলো কেন, শান্তিপুর-ফুলিয়া, ধনেখালি-বেগমপুর অঞ্চলে হলো না কেন, তার সঙ্গত কারণ দত্ত নির্দেশ করেননি। তাছাড়া জোলা শব্দটি খুবই শিথিল। বহিরাগত মুসলমানরা ভারতীয় হিন্দু বংশজাত মুসলমানদের জোলা বলতো (ভক্ত কবির জোলা ছিলেন)। জোলা মাত্রই তাঁতি নয়। তিতুমীরের শরিয়তী আন্দোলনে তাঁতিরা ছিল ঠিকই। তার কারণে অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁতিদের কাজ বাড়ীর মধ্যে। কৃষকদের মত খোলা মাঠে লাঙ্গল দিয়ে এধার থেকে ওধার মাটি কাটা নয়। সুতরাং অনবরত কানে মন্ত্রণা দিয়ে নতুন একটা মতবাদে দীক্ষিত করার পক্ষে তাঁতিরা সুবিধাজনক, কৃষকরা নয়। তিতুমীর দ্বীনের 'তারিখ শিখায়' বাড়ী বাড়ী ফিরতো। এই বাড়ী বাড়ী আক্ষরিক অর্থেই তাঁতিদের বাড়ী বাড়ী। তাছাড়া আশপাশের গ্রামগুলিতে জোলাদের আধিক্যও জোলাদের অংশগ্রহণের একটা বড় কারণ।

অনেকে আবার নীলকরদের অত্যাচারের কথা বলেন। বলেন তিতুরা নীলকরদের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নীলকররাই আগ বাড়িয়ে মৌলভীদের সঙ্গে শত্রুতা করেছিল। মৌলভীরা গোড়া থেকে নীলকরদের বিরোধিতা করেনি। নীলকররাই তিতুদের নতুন আপদ বলে চিহ্নিত করেছিল। আবার নীলকররা তিতুকে বাদশাহ বলে মেনে নিয়ে কর দিতে চাইলে তিতু তা মেনে নিয়েছিলেন। নীলকরদের সামগ্রিক উৎসাদন তিতু কখনই চাননি। তিতু চেয়েছিলেন 'দার-উল-ইসলাম'। সেই দারে 'কেতাবী' খৃষ্টানরা জিজিয়া কর দিয়ে জিম্মি হতে চাইলে তিতু আপত্তি করেননি। সুতরাং কৃষক X নীলকর, শোষিত X শোষক চেতনা এখানে অনুপস্থিত।

তিতুমীরের জেহাদকে চাপা দিয়ে কৃষক আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রাম বানাতে গিয়ে নানা জনে নানা মহিমাত্মক ঘটনা বিবৃত করেছেন। কেউ হান্টার উদ্ধৃত করে বলেছেন, মৌলভীরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল জমিদার গৃহ লুন্ঠন করেছিল। সুতরাং তিতুমীর অসাম্প্রদায়িক।

তথাকথিত নিরপেক্ষতার রহস্য এখন অবশ্য পাঠকের জানা। তিতুমীরের সময়ে গ্রামীন সমাজে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের কোনও পার্থক্য ছিল না। সেই সাবেকী মুসলমানদের তিতুমীর 'বেদ্বীন' বলেই মনে করতেন। তাঁরা যখন গ্রামীন সাংস্কৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিভেদপন্থী আরবীবদন তিতুমীরের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, তখন তিতুমীরও শত্রুতা করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে। সুতরাং তোষণবাদী হান্টারের বক্তব্য তাৎপর্যহীন। প্রকৃতপক্ষে লর্ড মেয়োর নির্দেশে হান্টার রচনা করেছিলেন 'ইন্ডিয়ান মুসলমান'। কারণ, দ্বিতীয় একটি সিপাহী বিদ্রোহের ভয়ে ভীত বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্য বজায় রাখার জন্য গ্রহণ করেছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি। মুসলমানদের তোষণ করে স্বদলে এনে হিন্দুদের বিশেষ করে বাঙ্গালী হিন্দুদের থেকে আলাদা করাই ছিল বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের ব্রত।

আর একটি বক্তব্য হলো, "ওয়াহাবী বিদ্রোহ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের ক্ষিপ্ত করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে টানিয়া আনে নাই।" টানিয়া যে আনে নাই, তাহা কিছুটা সত্য বটে, কিন্তু পুরোটা নয়। সরকারী নথিপত্রে প্রকাশ মৌলভীরা জমিদার বা ব্রাহ্মণ ছাড়াও সাধারণ রায়তদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল। এমনকি ধর্মান্তরিতও করেছিল তাদের।[৫.১৬] তিতুমীর যে ব্যাপকভাবে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের গায়ে হাত দেননি তার কারণ নিহিত অন্যত্র। শাহ ওয়ালিউল্লা সিলসিলার তিতুমীর স্বাভাবিক ভাবেই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের হালের বলদ বলেই ভাবতেন। সেজন্য তাদের কোতল করার তাগিদ অনুভব করেননি। দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলে তারা সহজেই জিম্মি হয়ে যাবে। নিয়মিত জিজিয়া কর দেবে। ফসল ফলাবে মুসলমান শাসকদের জন্য।

কেউ বা বিহারীলাল উদ্ধৃত করে বলেন, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তিতুর আবেদনে সাড়া দিয়ে খাজনা বন্ধ করে দেয়। সুতরাং ব্যাপারটা কৃষক সংগ্রাম।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে জেহাদের দিনগুলিতে খাজনা বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু সেটা তিতুর প্রতি ভক্তিতে নয়। আমরাও আজকাল ভক্তিতে গুন্ডাদের আবদার শুনি।

স্বপন বসু জেহাদের দিনগুলিতে নারীর ইজ্জত লুন্ঠন হওয়ার ঘটনাগুলিকে অতিরঞ্জিত বলে বর্ণনা করেছেন। যদিও নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথ ২৬.১১.১৮৩১ তারিখের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত সূত্র থেকে তিনি খবর পেয়েছেন যে অনেক হিন্দু পরিবারে লুটতরাজ ও বলাৎকারের ঘটনা ঘটলেও লোকলজ্জায় তাঁরা তা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনেননি।[৫.১৭]

স্বপন বসুর যুক্তি, বিদ্রোহ চলাকালীন পত্রিকাগুলিতে এমন কোনও সংবাদপাঠের সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।[৫.১৮]

কিন্তু সমকালীন পত্রিকাগুলিতে না থাকলেই ধর্ষন বা শ্লীলতাহানির ঘটনা মিথ্যা, এ বক্তব্য আজও অবাস্তব। আজও ধর্ষন ও শ্লীলতাহানির ঘটনার খুব সামান্য অংশই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বেশীভাগ ঘটনাই চেপে যাওয়া হয় মা-মাসীর মধ্যেই। কারণ, ধর্ষিতা নারীর ব্যাপক অবমুল্যায়ণ ঘটে পুরুষ শাসিত সমাজে। ফলে তসলিমা নাসরিণের খালা আত্মহত্যা করেন। স্কুলের চাকরী হারান তপন সিংহের ছবির নায়িকা (আদালত ও একটি মেয়ে)। সুতরাং সেই ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের বর্তমান বাদুড়িয়া থানার প্রত্যন্তের গ্রামের রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের সম্ভ্রমহানির ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশের দুরাশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বরঞ্চ জেহাদের সময় মুশরিক কাফেরের বউ-ঝি 'গনি মতের মাল।' সে কারণে পরম ভোগ্যা।[৫.১৯] জেহাদের পর্যায়ে যে বহু বদমাস নিছক লুটপাটের লোভে তিতুমীরেরা দলে ভিড়ে গিয়েছিল তা তিতুমীরের মামলার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ।[৫.২০] সুতরাং স্মিথের বক্তব্যে সত্যতা থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া সাজন গাজীর গানেও বামুনের মেয়ে জোর করে ধরে এনে 'নেকা' করার কথা আছে। সাজন গাজী তিতুমীরের সহযোদ্ধা এবং তিতুমীরের মামলার ৪৩নং আসামী। সাত বছর কারাবাস হয়েছিল সাজনের। জেলে বসেই সাজন সমস্ত ঘটনা নিয়ে গান লেখেন। সাজন গাজীর গান তিতুমীরের ইতিহাসের প্রাথমিক সূত্র বলে চিহ্নিত।

তিতুমীরের বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন বারাসতের অতিরিক্ত জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট কলভিন। কারণ স্যায়িদ আহমদ বেরিলবীর জেহাদী আন্দোলন সম্পর্কে

কলভিনের কোনওরকম ধারণা ছিল না। ওয়াহাবী আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আজও উলেমাদের হাতে। কেয়ামুদ্দিন আহমদ[৫.২১] জানিয়েছেন 'তারিখ-ই-আহমদী' বলে একটা পুঁথিতে তিতুমীরের বিদ্রোহের বর্ণনা আছে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও পশ্চিমপাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে তিনি পুঁথির সংশ্লিষ্ট অংশটি পাননি। বস্তুতঃ ওয়াহাবী বিদ্রোহের কথা সর্বসাধারণ জানতে পারে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, যখন পাটনা কেন্দ্রিক ভারতজোড়া ওয়াহাবী চক্রান্ত আবিষ্কৃত হয়।[৫.২১] সুতরাং মেটকাফ প্রভৃতি উচ্চপদের সরকারী কর্মচারীরা বেরিলবীর জেহাদী আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত থাকলেও কলভিন প্রভৃতি জেলাস্তরের সিভিলিয়ানদের তা অজানাই ছিল। সেই পরিস্থিতিতে যা স্বাভাবিক, জেহাদের ভয়াবহতায় হতবুদ্ধি কলভিন ব্যাপারটাকে অভাবের তাড়নার আন্দোলন বলেই ব্যাখ্যা করেছেন।

কলভিনের প্রতিবেদনে, "দলে এমন লোক ছিল না যাদের কিছু ক্ষয়ক্ষতির সম্ভবনা ছিল," বাক্যটিতে অনেকে অযথা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু কারণ অতি সহজবোধ্য; সাবেকী মুসলমানরা তিতুমীরের আরবীবদন ইসলামের প্রচারকে একটি শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নকারী উপদ্রব বলেই জেনেছিলেন। কিঞ্চিৎ ঘিলু যুক্তরা বৃটীশ বিরোধী তিতুমীরকে এড়িয়েই চলতেন। মৌলভীদের চিন্তাধারা ছিল মনোহর রায় ও ফটিক পাঠকের চিন্তাধারার সংমিশ্রণ। মাথা নেড়া দাড়িওয়ালা মৌলভীদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে চারশোও পৌঁছতে পারেনি। কারণ মৌলভীরা ছিলেন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিহীন, ইংরেজীতে যাকে বলে 'অ্যালিয়েন'। শুধু সেকালের নয় আরবীবদন ইসলামের প্রতি কিঞ্চিত বিরূপতা পীর-ফকিরদের দ্বারা ইসলামায়িত বাংলার গ্রামীন মুসলমানদের চিরকালীন।

বাংলার মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশ যে ওয়াহাবীদের ভাল চোখে দেখতো না, তার প্রমাণ সমসাময়িক সাহিত্যেও আছে:

এই মুল্লকেউ সেই ওহাবীর ফছাদ।
আসিয়া পৌঁছিল কত ঘটিল বিবাদ
(আকবর-ই-পীর-ই-নজদঃ আবদুল কাদির)

এলাহাবাদি এক এলো কুকামে মালুম হৈল সুকামে আসিনি বাঙ্গালায়।
দিল্লীর বাদশার সাথে জোগ আছে বিধিমতে নচেৎ এখানে এলো ক্যানো।
জাহেলের গুরু তিনি
মন ইচ্ছা এই তার সোন ধর্ম অবতার
বাঙ্গালাকে খালি হাত করা।
কোম্পানী বুঝি বা দাগা পায়॥
(সৈফ-অল-মোমেইনিন: অজানা লেখক)

এইসব সাবেকী মুসলমানদের সবাই জোতদার-জমিদার বা ধনী নন। ওয়াহাবী জেহাদের সৈনিকেরা নিম্নবর্গের হলেও জেহাদের সমর্থকরা প্রায়শই ধনী। মেটকাফের ডেসপ্যাচে উল্লেখ আছে দিল্লীর সম্রাটও জেহাদে উৎসাহদানকারী। পিন্ডারী আমীর খাঁ থেকে শুরু করে বহু বহু আমীর-জমিদারেরা যে জেহাদের রসদ জুগিয়েছিলেন, তা আজ প্রমাণিত। তঞ্চকতা করে হিন্দুদেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। গ্রাম বাংলার সাবেকী মুসলমানরা শরিয়ৎ সচেতন না হওয়ার জন্যই তিতুর সমর্থক হননি; তিতুমীর নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়ে জেহাদ করেছেন বলে নয়। সাবেকী মুসলমানদের সঙ্গে মৌলভীদের পার্থক্য ধনী-দরিদ্রের

নয়—বেদ্বীন-মোমিনের। তিতুমীরের জেহাদে কলিঙ্গা থানার দারোগা চাকুরী হারিয়েছিলেন, একথা কলভিন বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন প্রতিবেদনের ওই অংশটুকু লেখার সময়।

গৌতম ভদ্র তিতুমীরের বিদ্রোহকে জেহাদ বলে স্বীকার করলেও জেহাদে মাখিয়েছেন আমূল মাখন। 'একমাত্রিক' ইতিহাস থেকে বহুমাত্রাকে খুঁজতে গিয়ে গ্রামশি-গ্রস্ত গৌতম ভদ্র লিখেছেন, "সশস্ত্র যুদ্ধ অর্থে জেহাদের তিনটি লক্ষণ মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ পৌত্তলিকদের দ্বারা আক্রান্ত হলেই জেহাদ পালনীয়।"[৫.২১] জেহাদ সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়েই অনেক আলোচনা হয়েছে। জেহাদ ইসলামী উম্মার সম্প্রসারণের জন্য আগ্রাসী যুদ্ধ। মুসলমানরা বহু শান্তিপ্রিয় জাতিদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন। সেখানে তাদের একমাত্র অপরাধ, তারা মুসলমান নয়। তাছাড়া আক্রান্ত হওয়া ব্যাপারটা খুব শিথিল। কে কখন নিজেকে আক্রান্ত বোধ করবেন বলা মুশকিল। সুলতানী আমলে, হিন্দুরা গঙ্গাস্নান করলে বা হোলি খেললে অনেকে 'আক্রান্ত' বোধ করতেন। শিরহিন্দী গোহত্যাকেই ভারতে মুসলমানদের পবিত্র কর্তব্য বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। তারপর রণজিৎ সিংহ পাঞ্জাবে গোহত্যা বন্ধ করলে স্যায়িদ আহমদ বেরিলবী ইসলাম বিপন্ন বলে জেহাদ শুরু করেছিলেন।

গৌতম ভদ্র মৌলবাদীর লেখা 'সিরাতুল মুস্তাকিম' থেকে উৎকলিত করেছেন, "জেহাদের ফল আম জনতার ওপর বর্ষণের মত পতিত হয় এবং সেই মহানির্দেশের ফল দুই প্রকারের। একটা সবরকম লোকের জন্য। মোমিন, বিদ্রোহী, কাফের ধর্মদ্রোহী আর মোনাফেক, এমনকি জিন, পশু আর শস্যরা সেই (সুফলের) শরিক হয়।"

কিভাবে সুফলের শরীক হয় সেকথা আর তিনি খোলসা করে উৎকলিত করেননি। করেছেন অভিজিৎ দত্ত[৫.২৪] ওই একই উৎস থেকে: জেহাদে নিহত কাফের রাও দ্বীন নিষ্ঠ মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়ার জন্য স্বর্গবাসী হয়।

জেহাদের ফলে নিহত কাফেরের স্ত্রী কন্যারা যে গাজীদের ভোগের সামগ্রী হয় সেকথা বেশ কাব্যিক মেজাজে বলা হয়েছে: "তারা গোলাম হয়ে যাবার দরুণ সত্যনিষ্ঠ লোকদের সহবৎ হাসিল হয় আর তার ফলে এই আশা করা যায় যে তারাও সেই রঙে রঙ্গীন হবে"।[৫.২৫]

আসলে তিতুমীরের ইতিহাসের চাবিকাঠি হচ্ছে সাজন গাজীর গানের সেই ছোট্ট অংশটুকু:

নামাজ পড়ে দিবারাতি কি তোমার করিল ক্ষতি
কেনে কল্লে দাড়ির জরিপানা।[৫.২৬]

দাড়ির 'জরিপানাকে' কেন্দ্র করে মোমিন X কাফের সংঘাত বেরিলবীর জেহাদের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে গেছে হননের পথে।

তারপর?

তিতুমীর শহীদ হলেন। তিতুমীরের জেহাদের প্রত্যক্ষ অঞ্চল ছিল সামান্য কয়েক বর্গমাইল বিস্তৃত। কিন্তু 'শরা-শরিয়ৎ' ব্যাপারটা বাংলার মুসলমানদের ভাবিয়ে তুললো। সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক করে তুললো বাংলার মুসলমানদের। গোমাংস খাইয়ে হিন্দুদের জাত মেরে ইসলামায়িত করার ব্যাপারটি বেশ কৌতুকাবহ হয়ে উঠলো বাংলার মুসলমানদের কাছে। জনপ্রিয় হয়ে উঠলো সাজন গাজীর গান। অনেকেই গান বাঁধলেন তিতুমীরকে নিয়ে।

বিনয় ঘোষ সযতনে এড়িয়ে গেছেন সাজন গাজীর গান। যদিও তিনি এইসব গানের ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করেননি। তিনি লিখেছেন, ছড়াগুলি পরবর্তী কালে রচিত এবং সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। সেই কারণে একটি ছড়াও লেখাতে ব্যবহার করিনি।[৫.২৭]

সাজন গাজীর গানেতে স্পষ্ট যে গ্রাম বাংলার মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠছে। অর্থাৎ তথাকথিত কৃষক বিদ্রোহের ফসল হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। বিনয় ঘোষ ছড়া বাদ দিয়ে সেই নির্মম সত্যটিকেই অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিলেন।

হ্যাঁ, লোককান্ত সাবেকী ইসলামকে বিনষ্ট করে আরবীবদন শরিয়তী ইসলাম প্রবর্তনের চেষ্টায় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল গ্রামবাংলার অসাম্প্রদায়িক সমাজ। বেরিলবী ও তিতুমীর শহীদ হলেও তরিকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলন শেষ হয়ে যায় নি। বেরিলবী পর 'তরিকা' আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন পাটনার বেলায়েৎ আলী। তিনি সহোদর এনায়েৎ আলীকে বাংলায় পাঠান 'কাজ' করার জন্য। বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতন এনায়েৎ আলী। সংগ্রহ করতেন জেহাদের রসদ আর জেহাদী। কিন্তু অচিরেই বেরিলবীর আর এক মুরীদ জৌনপুরের মৌলভী কেরামৎ আলী ও পাটনার খলিফা বিলায়েৎ আলীর মধ্যে মতান্তর ঘটলো। ফলে ভাঙ্গন ধরলো দলে। কেরামত আলীর মতাবলম্বীরা তাইয়ুনি বলে আখ্যাত হলেন। পরে আবার একবার পাটনা খলিফার দলে ভাঙ্গন ধরলো। ভাঙ্গনের ফলে এবার জন্ম নিল আহল-ই-হাদিশ সম্প্রদায়। সুতরাং ওয়াহাবীরা বিভক্ত হলো তিনটি শ্রেণীতে। অন্য পূর্ণ-ইসলামায়নবাদী আন্দোলন 'ফরাজীর' প্রবর্তন করেন হাজী শরিয়ৎউল্লা। এই আন্দোলনের ধারা বহন করে চলেন তার পুত্র দুদু মিঞা ও পৌত্র নোয়া মিঞা।

ওয়াহাবী আন্দোলনের মত ফরাজীরা গোড়া থেকেই জেহাদের ডাক দেয়নি। তারা সারা দেশে শরিয়ৎ প্রবর্তনেই গুরুত্ব দেয়। কিন্তু তারাও বৃটীশ শাসন বাতিল করে দেশকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার প্রচেষ্টায় ছিল। দেশকে দার-উল-হরব ঘোষণা করেছিল তাঁরা। ফরাজীদের সঙ্গে বৃটীশ সরকারের সংঘর্ষ শুরু হলো যখন ফরাজী প্রভাবিত কৃষকদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য জমিদার ও নীলকরদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন সরকার। ফরাজীদের মধ্যেও বহুসংখ্যক লোক ওয়াহাবী জেহাদে অংশ নিয়েছিল বলে মনে করা হয়। কারণ সাধারণ ইংরেজ বিরোধী মানসিকতায় সবকটি মৌলবাদী আন্দোলনই এককাট্টা ছিল। এই সব মৌলবাদী আন্দোলন স্বতই হিন্দুবিরোধী হয়ে উঠেছিল। কারণ, দেশে খৃষ্টান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তাত্ত্বিক দিক দিয়ে পৌত্তলিক হিন্দুরা 'কেতাবী' খৃষ্টানদের থেকেও ঘৃণ্য।

ফরাজীরা গোটা দেশজুড়ে, বিশেষতঃ ব-দ্বীপের দক্ষিণপূর্বের জেলাগুলিতে এক সমান্তরাল সরকার চালাতে থাকে। তাদের বিনা অনুমতিতে কেউ বৃটীশ সরকারের কোনও সংস্থায় যেতে পারতো না। তিতুমীরের মতই ফরাজীরা যে হিন্দু ও খৃষ্টানদের বিরোধিতা করলো তাই নয়, সাবেকী লোককান্ত ইসলাম-বিশ্বাসীদেরও বিরোধিতা করলো। তিতুমীরের মত ফরাজী রাও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিমন্ডল বিনষ্ট করেছিল গ্রাম বাংলাতে। ব্রাহ্মণ ও হিন্দু দেবদেবীর অপমান করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতো না তারা। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল ফরিদপুর জেলার শিবচরে হাজী শরিয়ৎউল্লার পারলৌকিক অনুষ্ঠানের শেষে ৭খানি গ্রামে ৭৬টি বাড়ী লুট করেছিল ফরাজীরা। ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে ঢুকে লুটপাট করে বহু দেবমূর্তি ভেঙ্গেছিল। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল তাঁদের মতবাদে দীক্ষিত হতে অস্বীকৃত

এক সাবেকী মুসলমানকে। এ সবই শুধু নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য।[৫.২৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ওয়াহাবী ও ফরাজী উভয় মৌলবাদী আন্দোলনই সম্প্রীতির পরিমন্ডল দূষণ করে এক বৃহৎ সংখ্যক মুসলমানদের অবশিষ্ট দেশবাসীদের থেকে আলাদা করে দেয়। অন্যদিকে ওয়াহাবী ও ফরাজী তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ হিন্দুরা মুসলমান-মাত্রকেই ওয়াহাবী বা ফরাজী বলে ভাবতে শুরু করে। জমিদাররাও যে কোনও অবাধ্য প্রজাকে ওয়াহাবী বা ফরাজী বলে চিহ্নিত করতে থাকেন—সে জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক। ফলে মুসলমানরা সামগ্রিকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে অবশিষ্ট দেশবাসীদের থেকে। তাদের মন যায় শরিয়তের দিকে। 'সেরেক দিলে দীন কবুল করতে থাকে তারা'।[৫.২৯] উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দেখা যায় বঙ্গীয় মুসলমানরা নিজেদের শিকড় খুঁজছে। তারা যে শতকরা ১০০ ভাগ এই বঙ্গভূমির সন্তান, এ তারা মেনে নিতে পারছে না। তারা ভাবছে নেহাৎ দুর্ভাগ্যবশতঃ এ পোড়া দেশে জন্ম হয়েছে তাদের।[৫.৩০] দেখা গেল, বঙ্গীয় মুসলমানরা চর্চা করছে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতির। নিজেদের সম্পূর্ণভাবে আরবীবদন মুসলমান ভেবে মুসলমানদের সুবর্ণময় অতীত নিয়ে বিলাপ করছে: শরিয়তী ইসলাম তাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে আরব জাতীয়তাবাদ রূপে:

কোথা সে ভারতের স্বর্ণ সিংহাসন
কোথা সে স্পেনের মহিমা কেতন
কোথা সে আরবের প্রতাপ তপন
সকলি কি আজ ঘোর অন্ধকার।

(অনল প্রভাঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী)

এখন তারা সন্তানদের পুরোপুরি আরবী নাম দিচ্ছে। ত্যাগ করছে হারান প্রামানিক, চামার মৃধা, পোকাই প্রধান, নারায়ণ তরফদার , কিনু মন্ডল, রতন সাই মন্ডল, প্রভাত মল্লিক, রাখাল মন্ডল ইত্যাদি নাম—যেগুলো কোনও হিন্দুরও নাম হতে পারে।

পাবনার কালেক্টর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্য করলেন হিন্দু ও মুসলমানরা দিন দিন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আগে তারা হিন্দুদের স্পর্শ করা খাবার খেত, কিন্তু এখন যারা তা খাচ্ছে তাদের নীচ জাতীয় মুসলমান বলেই ভাবা হচ্ছে।[৫.৩১] পরে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন, ওয়াহাবীদের জেহাদী মনোভাব সম্পর্কে অজ্ঞ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হিন্দু বাঙ্গালীরা আজকাল দুঃখ করেন, মুসলমান কৃষকেরা চিরদিনই আমাদের পূজায় যোগদান করতো, আমাদের সঙ্গে খেতও। কিন্তু আজকাল সে রকম হয় না।[৫.৩২]

আগে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে হিন্দু ধরণের খুড়ো পিসী ইত্যাদি সম্বোধন চলতো। স্বর্গ শব্দটির ব্যবহার ছিল। সৃষ্টিকর্তা অভিহিত হতেন শ্রীশ্রী হক, শ্রীশ্রী ঈশ্বর শ্রীশ্রী করিম ইত্যাদি নামে। কিন্তু নব্য ভাবনায় আত্মীয় স্বজনগণ যেমন হলেন চাচা, খালা ইত্যদি, স্বর্গ তেমনই পরিবর্তিত হলো বেহেস্তে। সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ আকবর বা আল্লাহ গণি।[৫.৩৩] শ্রী শ্রীযুক্ত ইত্যাদি বাতিল হয়ে হলো জনাব, মীর। বাঙ্গালী মুসলমানদের রচিত পুস্তকের আরবী নাম হতে লাগলো: আকবর অল মারিফৎ বা বেদার অল গাফলিন। বাঙ্গালী মুসলমানরা পোষাকে-আষাকেও অবশিষ্ট ভারতীয়দের থেকে অভিন্ন ছিল। নব চেতনার ফলে মুসলমানরা ধুতি চাদর পরা ছাড়তে লাগলো। ওইসব পোষাকের মধ্যে হিন্দুত্ব অনুভব করলো তারা। একই ভাবে ভাষার মধ্যে যতদূর সম্ভব তৎসম শব্দ ছেঁটে ফেলে প্রবিষ্ট করতে লাগলো

আরবী-ফার্সী শব্দ। উর্দু এবং ফার্সী শেখার ঝোঁক বাড়লো তাদের মধ্যে। তারা উৎসাহিত হয়ে উঠলো আরব, তুরস্ক ও পারস্যের ইতিহাস চর্চায়। ওইসব দেশ সম্পর্কে রচিত হতে লাগলো নানা কাল্পনিক কাহিনী। তাতে লেখা হলো ওই সব দেশ হচ্ছে সব পেয়েছির দেশ। মিস্কিন শাহ খোন্দকার লিখলেন, তুরস্কেই প্রতিষ্ঠিত আছে ইসলামী সমাজ, সেখানে কারুর কোনও কষ্ট নেই।[৫.৩৪]

বঙ্গীয় মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের বাঙ্গালীত্বই অস্বীকার করলেন। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতে লাগলেন মীর, সৈয়দ, পাঠান ইত্যাদি বিশেষণে। বাঙ্গালী বলতে তারা বাঙ্গালী হিন্দুদেরই বোঝালেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় দেখা গেল বঙ্গীয় মুসলমানরা নিজেদের বাঙ্গালী বলছেন না। ছোট্ট একটা নমুনা হিসাবে হুগলীর ত্রিবেণীর উল্লেখ করা যেতে পারে। ত্রিবেণীর সমস্ত হিন্দুরা নিজেদের বাঙ্গালী বলে জানালেন। কিন্তু মুসলমানরা নিজেদের জানালেন স্যায়িদ, স্যায়িখ, পাঠান বলে। ইয়াকীনুদ্দিন আহমদ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লিখেছেন, কলকাতার যে সমস্ত মুসলমানরা জীবনে মারহাট্টা ডিচ পার হননি তাঁরা বাঙ্গালী হিন্দুদের বাঙ্গালী বলেন। যেন আরবী পয়গম্বরের মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে তাঁদের অবাঙ্গালী হবার অধিকার জন্মে গেছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে আবদুল হায়াত পূর্ববঙ্গের একটি মুসলমান প্রধান গ্রামে গিয়ে মোড়লের মুখে শুনলেন, হুঁজুর, এগ্রামে খালি মুসলমানরাই আছেন; এ গ্রামে বাঙ্গালীর বাস নাই।[৫.৩৫]

সেই মনোভাব এখনও অটুট পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যেও। নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের সময় তাঁরা নিজেদের বাঙ্গালী বলে উল্লেখ করেন না। অতি সাম্প্রতিক একটি গল্পের কয়েকটি লাইন হলো:

> বউটি বলল তোমাদের কোতাকে ঘর?
> পালটে প্রশ্ন করে বসে কাদের, কেন?
> তুমি বাঙালী না মুসলমান?
> বাঙালী নয়, মুসলমান।
>
> (আফসার আমেদ: অভিমান; গল্পপত্র: শারদ সংখ্যা ১৩৯৬)

এই সময় সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানদের শরিয়ৎ বোধগম্য করার জন্য বিভিন্ন ধর্মপুস্তক ও ইতিহাস বাংলা ভাষাতে রচিত হতে লাগলো। কোরাণের বঙ্গানুবাদ প্রথম করলেন অবশ্য একজন অমুসলমান—গিরীশচন্দ্র সেন। অনুবাদ ১৮৮১-৮৩ খৃষ্টাব্দে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুস্তক হলো, মহম্মদ নৈমুদ্দিনের জুবহাত-অল-ম্যাসায়েল। মুনসী সমীরুদ্দিনের বেদার-অল গাফলিন। স্যায়িখ আবদুর রহমানের হজরত মহম্মদের জীবনী ও ধর্মনীতি। সমীরুদ্দিন আহমদের মহম্মদীয় ধর্মসোপান, স্যায়িখ নবাব আলী চৌধুরীর 'ঈদ-উদ জোহা' ইত্যাদি।

বঙ্গদেশের মুসলমানরা শুধু হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্নই হলো না, ঐক্যবদ্ধও হলো। শতাব্দীর প্রথমভাগে তারা আশ্রফ, আতরফ, আজলফ, আরজল এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এখন বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভেদরেখা আস্তে আস্তে মুছে যেতে লাগলো। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হতে লাগলো মুসলমানরা। শতাব্দীর শেষে দেখা গেল। আতরফ, আজলফ ও আরজল মিলে মুসলমানরা একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে। আশ্রফরা নিজেদের সত্তা বিসর্জন দিতে রাজী না হলেও তাদের সংখ্যা নগন্য। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের গণনায় মোট

আশ্রফদের সংখ্যা ২ শতাংশের কম। এই জাতি আবার দ্রুত প্রসারণশীল হয়ে উঠলো। কারণ লোকগণনার ফলে তারা জেনে গেছে গোটা দেশে তাদের সংখ্যা মোট হিন্দুদের সংখ্যা থেকে সামান্যই কম। পরের দশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন উপায়ে জনসংখ্যা অবিশ্বাস্য রকম বাড়িয়ে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের লোক গণনাতে দেখা গেল বঙ্গদেশে তারাই সংখ্যাগুরু হয়ে গেছে হিন্দুদের পিছনে ফেলে।

এইভাবে গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হতে লাগলো প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রসারণশীল ও সংঘবদ্ধও হতে লাগলো। শতাব্দীর শুরুতে দুটি সম্প্রদায় একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি হেঁটে বেড়াতো; তিতুমীর-শরিয়ৎউল্লাদের পূর্ণ ইসলামায়ন আন্দোলনের ফলে দেখা গেল শতাব্দীর শেষে তারাই মুখোমুখি দাড়িয়েছে একে অপরের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি মেলে।

বিচ্ছিন্নতার এই ঘোলা জলে মাছ ধরতে এলো বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ। কারণ ইতিমধ্যে ঘটে গেছে সিপাহী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে শুধু যে সামরিক ইংরেজের মাথা কাটা হয়েছে তাই নয়, নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমেত বহু বেসামরিক ইংরেজকে। সুতরাং ত্রস্ত ইংরেজ দ্বিতীয় একটি সিপাহী বিদ্রোহের সম্ভবনা বাতিল করতে অবলম্বন করলো সেই রোমীয় নীতি—বিভেদ সৃষ্টি করো এবং দেশশাসন করো। এই বিভেদনীতির প্রয়োগে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের পরম সহযোগী হলেন এক উচ্চশিক্ষিত মুসলমান—স্যায়িদ আহমদ খান। তিনি উপলব্ধি করলেন পৃথিবীতে রাজতন্ত্রের দিন শেষ। ভারতীয় জনসংখ্যার চার পঞ্চমাংশই হিন্দু। সুতরাং গণতন্ত্রে হিন্দুরাই দেশশাসন করবে। এই হিন্দুদের হাত থেকে যথাসম্ভব ক্ষমতা ছিনিয়ে আনার মধ্যেই মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিহিত। এইভাবে একদা ওয়াহাবী জেহাদী ভাবধারায় দীক্ষিত স্যায়িদ আহম্মদ খান হয়ে গেলেন বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের প্রেমিক। গভর্ণর লর্ড মেয়োর নির্দেশে সিভিলিয়ান হান্টার মুসলমানদের তুষ্ট করার জন্য লিখলেন 'ইন্ডিয়ান মুসলমান'। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে শাহ্ ওয়ালিউল্লাপুত্র শাহ্ আবদুল আজিজ দেশ দার-উল-হুরব হয়ে গেছে বলে ফতোয়া জারী করেছিলেন। এখন পেটোয়া উলেমাদের দিয়ে নতুন করে ফতোয়া দেওয়া হলো, দেশকে দার-উল-ইসলাম বলে।

তারপর মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলো। সে সময়ে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায়, জাতীয়তাবাদে বাঙ্গালীরা ছিল অগ্রগণ্য। কাজে কাজেই হিন্দু বাঙ্গলার শক্তি খর্ব করার চক্রান্তে মেতে উঠলো বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ। বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত ফাঁদলো কুচক্রী অ্যান্ড্রু ফ্রেজার। ভঙ্গ হলো বঙ্গদেশ। অর্ধাংশে রইলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বাকী অর্ধাংশে অবাঙ্গালী সংখ্যা গরিষ্ঠতা। ভাষাগত ভাবে এবং ধর্মগতভাবে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে গেল হিন্দু বাঙ্গালীরা। বেশীভাগ মুসলমানই বঙ্গভঙ্গের সমর্থক হলো। নতুন মুসলমান প্রধান প্রদেশে হিন্দুদের সর্বনাশ করার মুসলমানদের উস্কানী দিতে লাগলেন গভর্ণর ব্যামফিল্ড ফুলার। ছাপা হতে লাগলো লাল ইস্তাহার। এই ইস্তাহারে হিন্দু বিধবা ও কুমারীদের নিকা করে পূর্ববঙ্গ হিন্দুশূন্য করার জন্য সংকেত দেওয়া হলো। এছাড়া ফুলার শাসিত প্রদেশের আদালতে হিন্দুবিধবাদের বলাৎকার করার দন্ড ছিল আড়াই টাকা জরিমানা। কুমারীদের ক্ষেত্রে ওটা বেড়ে হতো পাঁচটাকা।[৫.৩৩]

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের প্ররোচিত করে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিতে লাগলো। জামালপুর শহরে দাঙ্গার সময় সমস্ত নারীদের একত্রিত করে দয়াময়ী কালীবাড়ীতে রাখা হয়েছিল। নারী লুণ্ঠনের জন্য সারারাত ধরে দুবৃত্তরা আক্রমণ চালায় সেই কালীবাড়ীতে।

যাই হোক, বঙ্গভঙ্গ রদ হলো শেষ পর্যন্ত। আবার জোড়া লাগলো বঙ্গ দেশ। কিন্তু তাতে সুসম্পর্ক ফিরে এলো না, দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে। কারণ, বঙ্গভঙ্গের বহু আগেই তো মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তারা। এখন দূষিত পরিমন্ডল ক্রমাগত দূষিত হতে লাগলো সরকারী সুযোগ সুবিধার সাম্প্রদায়িক বন্টনের দাবীতে। ক্রমাগত দর কষাকষিতে দুটি সম্প্রদায়ের মাঝখানের জমি পরিণত হলো প্রসারিত খাদে। শেষ পর্যন্ত বঙ্গভূমিকে ভাগ করে জন্ম নিল এক দার-উল-ইসলাম—পূর্ব পাকিস্তান। তিতুমীরের জেহাদ সফল হলো তাঁর শহীদত্বের ১১৬ বছর পরে!

জয় হিন্দ

SOME RELAVANT BOOKS

The Life of Mahomet
By Sir Willium Muir
Mohammed and the Rise of Islam
by D. S Margoliouth
Indian Muslims: Who are They
by K. S. Lal
Politics of Conversion
edited by Devendra Swarup.
Hindu view of Christianity and Islam
by Ram Swarup
Hinduism—The Eternal Tradition
by David Frawley
A Secular Agenda—To save our Country to weld it.
by Arun Shourie
Indian Controversies—Essay on religion in Politics.
by Arun Shourie.
Negationism in India
by Koenrad Elst
Hindu Temples: What happened to them (A Preliminary Survey)
by Arun Shourie, Ram Swarup, Sita Ram Goel
HIndu Temples: What happened to Them (The Islamic Evidence)
by Sita Ram Goal.
Ayodhya and After: Issues Before Hindu Society
by Koenrad Elst.
Tipu Sultan: Villain or Hero
An anthology by Bombay Malayalee Samajam.

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের

চাঞ্চল্যকর মিথভাঙ্গা গবেষণা

নবরূপে ডিরোজিও

সেকুলার লেখকেরা তঞ্চকতা করে ডিরোজিওকে নাস্তিক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেও ডিরোজিও নিজেই তাঁর আস্তিকতার কথা ঘোষণা করে গেছেন। উপরন্তু বলেছেন, নাস্তিকরা বড় মূল্যবোধের পরিপন্থী। সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশে এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের কাছে বৃটিশরাজ ছিল কাঙ্খিত ব্যাপার। এই বৃটিশ রাজকে চিরস্থায়ী করতে পারতো একমাত্র এক বাদামী জাতি। যে জাতি ধর্মে খৃষ্টান, সংস্কৃতিতে মদ্য-গোমাংস ভোজী ইংরেজ। কানাডায় বা অষ্ট্রেলিয়ায় চলে না গিয়ে এই বাদামী ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে যেতে পারতো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা। সেই আকাঙ্খাতেই তৎকালীন হিন্দুসমাজের রত্নতুল্য কয়েকটি কিশোরকে হাতে পেয়ে তাদের গোমাংস খাইয়ে জাতিচ্যুত করে খৃষ্টানীর ও বিদেশী সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন ডিরোজিও। মৌলবাদী আলেকজাণ্ডার ডাফের মত ডিরোজিও-ও হিন্দুধর্মকে মিথ্যা ধর্ম বলে ঘোষণা করেছিলেন। নিজস্ব পত্রিকা 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ানে' মাধবচন্দ্রকে দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছিলেন রামমোহনের প্রতি বিদ্রুপ ও বিদ্বেষ।

খৃষ্টধর্ম প্রসারকার্যে ডিরোজিওর এই পরোক্ষ ভূমিকার কথা স্বীকার করে গেছেন আলেকজান্ডার ডাফ। স্বীকার করেছেন আধুনিক পাদ্রী ফাদার ফালোঁ। এই জেস্যুইট পাদ্রী লিখেছেন, ডিরোজিওর প্রভাব ডাফের পথ তৈরী করে দিয়েছিল।

তথ্যসমৃদ্ধ এই বই এক যুগান্তকারী সৃষ্টি বলে পরিগণিত হচ্ছে। দাম-পঞ্চাশটাকা।